নলী ভৌমিক

ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড
৮৭, চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ চৈত্র ১৯৫৩

প্রকাশক

সুনীলকুমার সিংহ

ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড

৮৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

মুদ্রাকর

সুধাংশুরঞ্জন সেন

ট্রুথ প্রেস

৩, নন্দন রোড, কলিকাতা

ছবি ও প্রচ্ছদপট

মাখন দত্তগুপ্ত

ব্লক নির্মাণ ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও

৭২-১, কলেজ স্ট্রীট

বাঁধিয়েছেন

বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

৫০, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট

কলিকাতা

দাম ছ টাকা বারো আনা

গল্পগুলির রচনাকাল ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যে

মা-কে

সূচীপত্র

সকালবেলাকার সূর্যেব আলো লুফে নিলো হাওড়া ব্রীজের চূড়ো। ছাই রঙের জেটি ও ওয়েব-হাউসগুলো গাদাগাদি করে অদ্ভুত এক বক্তব্যে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। গঙ্গার ঘোলা জল দূর থেকে দেখায় শাদা আর শক্ত। কলকাতা।

ইন্ বাউণ্ড্স্। আউট অব বাউণ্ড্স্।

ক্যামেরা হাতে নিয়ে ঘুরছে মিত্রপক্ষের উৎসুক দু-একজন সৈন্য। ছবি তোলার বিষয়বস্তুর বড়ো অভাব। ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে রাস্তাগুলো। মানুষ মরে নেই—ভীড় নেই আতঙ্কিত উপবাসীদের। যারা বেঁচেছিল, ছেলে আর বুড়ো—বাংলা সরকার আইন করে খেদিয়ে দিয়েছে তাদের। যারা মরেছে, হাঁড়িকুঁড়ি কাঁথা কানি সমেত তাদের ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেওয়া হয়েছে। আর নিঃশব্দে যোয়ান বয়সী মেয়েরা হারিয়ে গেল কোথায়।

ক্লিক্ ক্লিক্—

ঘাগরা-পরা দুটো বাঁদর নাচিয়ে নাচিয়ে খেলাওয়ালা রাস্তার লোককে

খেলা দেখাচ্ছিল। মোটামুটি 'ভরিয়েন্টাল' বিষয়বস্তু, পাঁচ সাত আগেকার ফুটপাথের ছবির মতো 'ফার্স্ট রেট্' না হলেও।

দুর্ভিক্ষ শেষ হয়ে গেল এদেশে?

হঠাৎ হুইসিল বাজে। ঠেলাওয়ালা আর রিক্সাওয়ালাদের ঠেলে রেখে সারি বেঁধে মিলিটারি গাড়ী যেতে শুরু করে একের পর এক। রাস্তার লোকেরা ভীড় করে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে। হিংসে হচ্ছে, রাগ হচ্ছে? কে জানে।

হেল্লো—

ছুটন্ত গাড়ী থেকে কলার খোসা ছুঁড়ে দেয় কয়েকজন ফূর্তিবাজ আমেরিকান।

গাঁয়ের লোকটি ফিরে এসে চোখ বড়ো বড়ো করে বলেছিল চালের কথা: হ্যাঁগো, উই গাদা করে থুয়েছে; পাহাড় প্রমাণ গো। বলে, চাল নাকি পচা। গাড়ী-বোঝাই নিয়ে গিয়ে ফেলে দিচ্ছে। পাহাড় প্রমাণ— হ্যাঁগো; হক্ কথা—

ওইটুকুই খপর। ওর বেশী জানতো না লোকটি। কেনই বা অত চাল ওখানে জমা হয়েছিল, কেনই বা সেগুলোকে পচে যেতে দেয়া হয়েছে। বোটানিক্যাল গার্ডেনের ভেতর দিয়ে আসার সময় থমকে দাঁড়িয়েছিল দৃশ্যটা দেখে। একটু হাঁ হয়ে গিয়েছিল মুখটা; পিঠের শিরদাঁড়াটায় শির্ শির্ করে কি একটা ওঠানামা করেছিল। তাড়াতাড়ি গাঁয়ে ফেরার যথেষ্ট তাগিদ থাকা সত্ত্বেও প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। কাছে গিয়ে চালগুলো নেড়ে চেড়ে দেখার সাহস হয় নি।

ফিরতি-পথে তিনজন রাখাল ও একজন ঘুঁটেকুড়ুনী বুড়িকে যেচে

খপরটা জানিয়ে দিয়েছে ও। তারপর গাঁয়ে। দিন কয়েক ধরে প্রত্যেকটি পুরুষ ও মেয়েকে একাধিকবার একই গল্প বললে। রুদ্ধশ্বাস ঔৎসুক্যে সবাই জিনিসটা শুনলো। ম্যালেরিয়ায় ভোগা মেটে হলদে রঙের চোখগুলো জলে জলে উঠেছিল, কেউ জান্‌তো না কেন।
গয়লা বৌ জান্‌তো। গত দুর্ভিক্ষে গরু দুটি আর এবারকার দেশজোড়া মড়কে স্বামীটিকে খুইয়ে অনেক জিনিস খুব সহজে বুঝতে পারে সে। মালপাড়ার মেয়ে দুটিকে বললে, চল না গো। সব চালই কি আর একেবারে পচা হবে, আর মানুষকে কি তবু বেঁচে থাকতে হবে না? অতএব গয়লা বৌ, কমলা, মালপাড়ার মধ্যবয়সী আব তিনজন মেয়ে ঝুড়ি কাঁখে রওনা হল। শিবপুবেব বাগান আর কত দূর? পাচ ক্রোশ?

বিখ্যাত বিলিতি হোটেলেব ওপর তলায় তাজা চায়ের গন্ধ। সমর বিভাগ থেকে ধার নেয়া সুদক্ষ ভদ্রলোকটি আপাতত ১৫৪নং স্যুটেই রইলেন। কলকাতায় এত জায়গাব অভাব! গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে অতিরিক্ত জরুরী বন্দোবস্তেব ফলে শেষ মুহূর্তে তবু যাহোক এটিকে ফাঁকা করে নেয়া গেছে। ছোট্ট এই বাসস্থান সংগ্রহেব ব্যাপারেই অসামরিক বিভাগগুলোর স্বাভাবিক অপটুতা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে বৈকি। এ সম্বন্ধে কাল রাত্রেই তিনি রীতিমতো একটা নৈতিক কর্তব্য-প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। এবং যদিও ডিনারের পর নাচঘরে একটু ফূর্তি করে আসার অদম্য ইচ্ছা তাঁর ছিল, তথাপি তিনি জায়গাটা শুধু মাত্র শুঁকেই চলে এসেছিলেন বলা যায়। অসামরিক সরবরাহ বিভাগের নতুন দায়িত্বগুলি সম্বন্ধে তাঁকে কি। [illegible] চিন্তা করতে হবে না?
ঘণ্টা দিয়ে হোটেলের পরিচারককে জানিয়ে দিলেন, তাঁকে যেন

'ভারতীয়' চা দেয়া হয়। তারপর ব্যালকনীতে গিয়ে দাঁড়ালেন; চশমাটা খুলে ডান হাতে নিয়ে চৌরঙ্গী আর ময়দানের দিকে তাকিয়ে তৃপ্ত হলেন। চশমা-পরা লোকের স্বাভাবিক অভ্যাসবশত চোখ দুটো কুঁচ্কিয়ে ছোট করে এনে ভারতবর্ষটাকে আঁচ করে নিলেন একটু।
তারপর খবরের কাগজে দেশী খবরটুকুর ওপর চোখ পড়ল: ওদের দুজনের কথাবার্তা ফেঁসে গেছে। 'ভারতীয়' চায়ে চুমুক দিয়ে অদ্ভুত আরাম পেলেন।

লিক্লিকে ঘাড়ের ওপর প্রকাণ্ড এক মাথা, পেছন দিকে হেলানো। গভীর দুই গর্তের নীচে একজোড়া চোখ, অসুস্থ মানুষের মতো উজ্জ্বল। হাড়। বৌবাজার স্ট্রীট দিয়ে একটি মানুষ হাঁট্ছে। হাঁট্তে হাঁট্তে থম্কে দাঁড়াল: ভীষণ নোংরা ফুলো-ফুলো-মুখ গোটা দুই চীনে ছেলে পাশের বস্তির আর কয়েকটা বাচ্চার সঙ্গে মহোল্লাসে খেলা করছে। গোটাকতক কাঠি, একটা ভাঙা চাকা, একটা টিনের বাক্স্, চামড়ার টুক্রো কয়েকটা। মানে না বুঝেই দুটো ছেলে চীৎকার করছিল—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ। অনেকক্ষণ আগে এই পথ দিয়েই একটা মিছিল চলে গিয়েছিল কোথায়। মিছিলের শ্লোগানগুলো কেমন যেন ভাল লেগে গেছে বাচ্চাগুলোর।
বিড়ির দোকানের উঁচু বেদীটায় আরো কয়েকজনের সঙ্গে বসে দুল্ছে ইয়াসিন, পুরোনো ডায়নামোর ভোল্ট্-মিটারের কাঁটার মতো। মুখ বুজে কাজ করছে ওরা; কাজ করার দ্রুত তালে ক্রমশ যন্ত্রে পরিণত হয়ে গেছে। হাঁটুর ওপর মসলার পাত্রটা ক্রমাগত নড়ছে; টান টান হয়ে উঠেছে মেরুদণ্ড কাজের অস্বাভাবিক ঝোঁকে; মাথাটা ঈষৎ নুয়ে পড়েছে তীক্ষ্ণ মনোযোগে। এখন কথা বলা বারণ। কথা বললে কাজ এগোয়

না। ছেলেদের জন্যে ঈদের নতুন কামিজ কিনে দেয়া ইস্তক ইয়াসিনের খাটুনির বেগ বেড়ে গেছে : বকেয়া দামটা যতো জলদি শোধ হয়, আর কি।

বারুইপুরের কাছাকাছি একটা গাঁ থেকে একজোড়া স্বামী-স্ত্রী কলকাতায় এসেছিল সিনেমা দেখতে। তেইশ বছরের স্বামীটি রোজ কলকাতায় আসা-যাওয়া করে সব্জি নিয়ে। রাত্রে বৌকে বলত শহরের গল্প, এবং গল্পের শেষে যোগ করত—

"চল্ তোরে শহর দেখাইয়ে আনি—"

ভীতু বৌটা শ্বশুর শাশুড়ীর সামনে ঝোঁক ধরতে সাহস পায় নি এতকাল, তারপর আজকে স্বামীটি সকালবেলায় উঠে মুড়ি খেতে খেতে বলেছিল—

"তা অলে গিয়ে তোমাদের বউডাকে ল্যা যাই গো; ছেলেমানুষ—সখডা ওর মিটাইয়ে আনি।"

বিস্মিত মা চোখ বড়ো বড়ো করে জিজ্ঞেস করেছিল : ছেলের মাথা কি খারাপ হল ?

"না—বলছি কি, বুইলে, যাই আজ লিয়ে। ছেলেমানুষ—তোমাকেও না হক একদিন ল্যা যাবো; দেখে এসবে—"

অতএব সতের বছবের আঁটসাঁট ছেলেমানুষ বৌটি পুজোয় কেনা মিলের শাড়ীটায় সমস্ত দেহ অনেকটা ব্যাণ্ডেজের মতো করে জড়িয়ে স্বামীর হাত আঁকড়ে ধরে শহরে এসে পৌছল। ট্রেনে ওঠানামা করার সময় স্বামীটি সদাসর্বদা উপযোগী উপদেশে বৌটিকে প্রায় মুগ্ধ করে ফেলল। আর তারপর কলকাতার রাস্তায়, ভীড়ে বৌটি যখন স্বামীর দ্রুত হাঁটার সঙ্গে তাল রেখে বাঁ হাতটা ভীষণ জোরে আঁকড়ে ধরে

শরীরের সঙ্গে মিশে যাওয়ার যুগপৎ চেষ্টায় আঁট শাড়ীকে উপেক্ষা করে লম্বা লম্বা পা ফেলছিল, তখন মুগ্ধ হয়ে স্বামীটি বলল :

"কিন্তুক শহর ঠিক্ ঠিক্ দেখে লিও গো—"

ঘোমটার তল থেকে বালকের মতো একজোড়া চোখ ব্যস্তবাগীশ মানুষটার চিবুকের দিকে চাইল।

তেমন মনে করে রাখার মতো দৃশ্য নয়—শুধু পথ-চলতি লোক, উৎসুক দোকানদার আর রেস্তোরাঁর তর্কপ্রিয় মানুষদের মুখ থেকে কয়েকটা তাচ্ছিল্যসূচক মন্তব্য আকর্ষণ করে মাত্র। ছেঁড়াখোঁড়া অসংহত মিছিলটা আবার দেখা যায় নিঃসঙ্গ চীৎকার করতে করতে রাস্তা দিয়ে এগুচ্ছে। কয়েকজন ছাত্র আর একদল নানা শ্রেণীর মজুর। নোংরা বেশভূষা আর দরিদ্র রুক্ষ চেহারায় একটানা ছাই রঙা স্রোত একটু। লাল ঝাণ্ডাগুলো ক্ষতচিহ্নের মত দগ দগ করে ওঠে শুধু।

"কমিউনিস্ট। শালা—"

টেনে-কাপড়ে কে একজন মন্তব্য করে হা হা করে হাসে। তারপর ভুলে যায় মিছিলটার কথা।

"কোন আশা নেই আমাদের দেশের।"

"নাঃ শালা কিছু হবে না।"

"লোকগুলো স্রেফ মরে গেল। মরবি তো লুটপাট করে মর্। না খেয়ে শুকিয়ে মরার চেয়ে বন্দুকের গুলিতে মরে যা—"

"ওহো! শুনেছ?"

"কি?"

"আমেরিকানরা ওদের খাকি টুপি বদল করে গান্ধী টুপি মাথায় দিচ্ছে অনেকে। কাগজে বেরিয়েছে……"

গয়লা বৌ, কমলা, মালপাড়ার আর তিনজন মেয়ে ধুলোভর্তি পা নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল গার্ডেনের বাইরে। ঈশ্বরই সাহায্য জুটিয়ে দেন। চালের যোগাড় করে দেবে, বললে লোকটা। তারপর ওদের নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখল এক জায়গায় : দাঁড়াও আসছি।

রোগে ভুগে-ভুগে ষোল বছরের কমলার চেহারা হয়েছে রোঁয়া-ওঠা শালিকের বাচ্চার মতো। তাকিয়ে থাকা যায় না। মালপাড়ার মেয়ে তিনটিকে মানুষ বলে মনে করতে কষ্ট হয়। সাঁইত্রিশ বছরের গয়লা বৌই ওদের মধ্যে সমর্থ। যৌবন শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এক ধরনের পুরুষোচিত চেপ্‌টা সবলতায় কেমন শক্ত মনে হয় ওকে।

আধ ঘণ্টা পরে লোকটা ফিরে এসে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। তারপর আঙুল দিয়ে গয়লা বৌকে দেখিয়ে বললে—

“এই, তুমি এসো; এক একজন করে চাল নিতে হবে কিন্তু—সব একসাথে গেলে ধরে নিয়ে যাবে—”

কি হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু চাকরি মিলেছে সবারই। বাঙালী ঘরের লেখাপড়া জানা ছেলেদের আস্থায়ী আপিসে ডেকে নিয়েছে। মাসের শেষে ছাপা নোট মিলছে কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য আসছে না। ভদ্র ও অসন্তুষ্ট মানুষগুলো বাড়ী ফেরার আগে নিজেদের ধিক্কার দেবে। বলবে, প্রতিভার দাম মিলল না। ফাইলে ফাইলে নাক গুঁজে বিষণ্ণ অনেক কটি মন।

ব্যাঙ্কের সেভিংস্ কাউন্টারের পেছনে নিরীহ-মুখ উঁচু টুলের ওপর বসে আছেন পেণ্টুর বাবা ; নিকেলের চশমার কাঁচের পাশ দিয়ে তাকান। নিজের ওপর কেমন একটু বিশ্বাসের অভাব।

“আপনার পাশ বইটা? কী নাম বল্‌লেন? জে, কে, বোস? লালমোহন কোম্পানীর তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই—”

শেষের দিকটায় বিড়বিড় করে আরো কতকগুলো কি বললেন, পাওনাদারের কাছে বিব্রতভাবে মানুষ যে ধরনের অর্ধোচ্চারিত কথা বলে। কিন্তু পাশ বইটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পেণ্টুর বাবার আঙুলগুলোয় একটা ভীত ক্ষিপ্রতা নেমে আসে—

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই—"

"আঃ কোথায় যে গেল খাতাটা। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন—"

"জমা দেবেন তো—"

সমস্ত কাউন্টারটা তোলপাড় করে অবশেষে পাওয়া গেল। পেণ্টুর বাবা মুগ্ধের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন, তারপর হয়তো নিজেকেই শুনিয়ে বলেন—

"কর্মীলোক—এই তো বছর দুয়েক কনট্রাক্টরী করে এই ব্যাঙ্কেই লাখ দেড়েক টাকা রেখেছেন—" একটু থামেন, "হ্যাঁ, আপনার কী চাই?

"একটা জমা-দেবার বই দেবেন, ফুরিয়ে গেছে—"

"জমা? একটু দাঁড়ান—" পেণ্টুর বাবা আবার উৎসাহিত হয়ে উঠেন। কিন্তু এবারও প্রার্থিত জিনিস মিলল না। কী আশ্চর্য, ভদ্রলোক জমা দেবেন, দাঁড়িয়ে আছেন—যাক্, অবশেষে পাওয়া গেল।

"আপনার কী চাই?"

"উইথড্রয়াল ফর্ম দুটো দেবেন, আর পাশ বইটা—"

"কী! জমা দেবেন না—" আহতভাবে প্রশ্ন করলেন পেণ্টুর বাবা।

"না—"

না? ভদ্রলোক সত্যিই মর্মাহত হন। উৎসাহ কমে আসে। অথচ অন্যলোক টাকা জমালে পেণ্টুর বাবার কী লাভ?

……কাজের ঝোঁকটা একসময় কমে আসে ঃ বিড়ির দোকানের উঁচু বেদীর ওপর ঢুলতে ঢুলতে ইয়াসিন থামে। আলগা হয়ে যায় আঙ্‌লগুলো। পা দুটো ছড়িয়ে নিতে পারলে ভাল হত। দু-একটা কথা বলা চলবে এখন।

"শুনা হ্যায় ?"

আব্‌দুল মাথা নীচু করেই প্রশ্ন করে—"ক্যা ?"

"ও নে বিগড়্‌ গিয়া ; রেডিও মে বোলা হ্যায়—"

"ক্যা—?"

"গান্ধী-জিন্না মোলাকাৎ ?"

"—আফ্‌সোস্‌"

হঠাৎ আচমকা থেমে গিয়ে ইয়াকিন ঝুলে পড়ে কাজ করতে শুরু করে আবার। অনেকক্ষণ পরে আবার বিড়বিড় করতে শুরু করে হঠাৎ "—কভি নেই মিল শকতা উন লোগ, কভি নেই। খানে বিনে মর যাও তুম গরিব—তুমহারা লেড়কাকা পেহনেকা কাপড়া নেহি—বিলকুল মর যাও তুম গরিব……"কেমন একটা চাপা রাগ টের পাওয়া যায় ওর কথায়।

"ক্যা বলতে হো তোম পাগলাকা মাফিক ?"

"কুছ নেহি !"

অভিজাত পাড়ার সাতমহলা বাড়ীর দেয়ালে দেয়ালে দ্বিপ্রাহরিক রেডিও গুমরিয়ে যাচ্ছে। দামী সোফার ওপর ছড়িয়ে পড়ে আছে শকুন্তলা ঃ ভাল লাগে না। বান্ধবীকে প্রশ্ন করল—

"কী করবো বল্‌তে পারিস ?"

"বিয়ে কর্‌"

"বিয়ে না করার তেমন কোন ইচ্ছে আমার নেই। সেনকেই যে ভালবাসি তারো কোন মানে নেই—কিন্তু সে কথা নয়—কী করবো ?"

"করবি আবার কি ? সবাই যা করে—"

"সাপ্লাইয়ে একটা চাকুরি নেবো ? কিন্তু নিয়েই বা কী হবে ? ভাল লাগবে না।" বান্ধবী উত্তর দেয় না। সিনেমা সাপ্তাহিকটায় কলম বুলোয় শকুন্তলা। জনপ্রিয় অভিনেত্রীর ঠোঁটের ওপর মোছ্ গজিয়ে ওঠে ; বিলোল কটাক্ষকে কুৎসিত করে দিয়ে আঁকাবাঁকা রেখায় আঁকা হয় চশমা।

"কি জানিস ? বাইরে থেকে লোকে মনে করবে, আমি একজন আধুনিক ইমান্‌সিপেটেড্ গার্ল। কিন্তু আমার এই আধুনিকতার কী দাম, আমার নিজের মনেই যদি আস্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা না রইল ?"

জনপ্রিয় অভিনেত্রীর থুত্‌নিতে শেষ পর্যন্ত দাড়ি গজিয়ে উঠল।

"উৎসাহিত হই না—কিছুতেই না ; তবু শুনবো, সেন এবারকার ট্রান্‌জাক্‌শানে গভর্নমেণ্টকে ফাঁকি দিয়ে দেড় লাখ টাকা লাভ করবে, তার খবর। মিঃ শিক্‌দার নতুন বাড়ীটায় ওয়াল-পেইন্‌টিং কাকে দিয়ে করাবেন তার সমস্যা। একটা পথ আছে—সিনেমায় নামা। মন্দ হয় না। বছর দুয়েক দুর্নাম ও দুর্ঘটনার ঝাজে বেঁচে ওঠা চলে : তারপর সারা জীবন ধরে নিজেকে ভীষণ দুর্ভাগা বলে ভেবে নিতে পারলে বাকী জীবনটাও চলে যাবে একরকম। কিন্তু—"

জনপ্রিয় অভিনেত্রীর খোঁপাটা এতক্ষণে হিজিবিজি রেখায় পাগড়ীর মতো দেখাচ্ছে।

"কিন্তু তাও যাবো না বোধ হয়।"

দেয়ালে দেয়ালে রেডিও গুমরিয়ে যাচ্ছে ওরা কেউ শুনবে না যদিও।

"কী করবো বল্‌তে পারিস্ ?

বছরের এই সময়টায় নাকি বেড়ালদের বাচ্চা হয়। তাই হয়েছে বোধ হয়। পায়খানার ছাতের ওপর দুটো বেড়ালের বাচ্চা খেলা করছে। টেলিফোনের তারের ওপর একটা কাক কিছুক্ষণ দুলে উড়ে গেল। গলির ছায়ায় একটা রিক্‌সা দাঁড়িয়ে আছে, অনেকক্ষণ ধরে। এই অন্দরমহলের খুড়ী অন্য অন্দবমহলের পিসীর বাড়ী বেড়াতে যাবে। কিছুক্ষণ পরে সস্তার সায়া হেঁকে যাবে একজন ফিরিওয়ালা। এই পাড়ার পুরুষরা আপিস পাড়ায় টাকা রোজগারের জন্য পরিশ্রম করছে এখন। সেই আপিস পাড়ার রাস্তায় ফল বিক্রি হয়, ছাড়ানো শসা, কলা, বাতাবী লেবুব কোয়া। ফল খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল! টিফিনের সময় আপিসেব বেয়ারা ঠোঙায় করে ফল নিয়ে আসে।

হেবু আসে।

গোল মুখ; উদ্দাম জীবনীশক্তি। মোটা চেহারা—চর্বি আর রক্ত আর পেশী। স্মার্ট। দুরন্ত গল্প করে। জীবনটা বোহিমিয়ান। সব কিছু তুচ্ছ করার মতো ত্বরিৎ বুদ্ধি।

"ও স্টেট্‌স্‌ম্যানের খপব বলছিস? ফুঃ—" সহসা মনে হল যুক্তির চেয়ে ভঙ্গীটাই দামী। কয়েকজন ঘিবে এল: সপ্রশংস বিব্রত চোখ। পেণ্টুর বাবা নিকেলের চশমাটা কোঁচার খুট দিয়ে ঘন ঘন মুছতে থাকেন।

আর বেপরোয়া দেবু। অত জোরের সঙ্গে কোন্ রকম মন্তব্য না করে গান্ধী জিন্নাকে যে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারে! তার চেয়ে প্রেম, যৌন অভিজ্ঞতা, মিলিটারি জীবনের আমেরিকান মুখখিস্তি—অনেক স্বাদময়। কয়েকজন হাসে। একটু ভীতু, বোকা, সপ্রশংস হাসি। একটু দুর্বল হিংসা। কয়েকজনের জীবনে প্রেম নেই, বউ

আছে; মোটা মাইনে নেই, ব্ল্যাক মার্কেট আছে; উদ্ধত দৃষ্টি নেই, ফেরারী স্বপ্ন আছে। দেবু কথা বলছে; দেবু মুখখিস্তি করছে; দেবু তার ভুঁড়ির ওপর মোটা হাত দিয়ে থাবড়া মারছে, পকেট থেকে সিগারেট বার করে একসঙ্গেই ধরাচ্ছে দুটো।

আর কয়েকজন হাসছে, ঘেঙিয়ে ঘেঙিয়ে।

তেইশ বছরের স্বামীটি থম্‌কে দাঁড়াল বউটির হাত ধরে।

রাস্তা দিয়ে একটা পাগল হেঁটে আসছিল। পাগলই; কারণ পরনে কাপড় চোপড় কিছু ছিল না; শুধু ঊর্ধ্বাঙ্গে ছেঁড়া ময়লা একটা কোট যার ওপর ততোধিক ময়লা একটা চাদর।

"দেখেছো?"

বোবার মতো ঘোমটার তল থেকে ফিস্‌ফিস্‌য়ে বললে বৌটি—"কী?"

"লোকডারে আমি চিনি; হ্যাঁ আলবৎ চিনি। বারুইপুর এস্টিশানে কতদিন দেখেছি—" ঘোমটার তল থেকে বিস্ফারিত চোখে চাইছিল বৌটি।

"চেনা মানুষ? হ্যাঁ গো?"

"কদমপুর গাঁয়ের চাষী; মোছলমান; পোদ্দারের জমিতে আধিতে চাষ করতো গো; শেষতক্‌ ওবছর আকালে দেশান্তরী হল—আহা-হা—" পাগলটা আস্তে আস্তে ওদের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে গেল। বৌটির মনে হল গাঁয়েব মানুষদের মতই কী একটা চেনা আদল লোকটির মুখে চোখে রয়েছে যেন। কী যেন! নিজের গাঁ, ঘর হলে ডেকে দুটো মুড়ি খেতে দিত দুর্ভিক্ষের লোকটাকে, আলগোছে উঁচু করে জল ঢেলে দিত তৃষ্ণার্ত অঞ্জলি ভরে।

"চলে আয়—" হঠাৎ ধমক দেয়ার কী কারণ ঘটল, কে জানে—"দেখতে হবেনি—" হন্‌ হন্‌ করে হাঁটে স্বামীটি।

বিকেল পাঁচটায় সেনের সঙ্গে মোটরে উঠতে গিয়ে শকুন্তলার সমস্ত শরীরটা কেমন যেন করে উঠল। মা গো! বাড়ীর চাকর বাকরগুলো যেন কী! কারো নজরে পড়েনি নাকি? অভিজাত বাড়ীটার সৌখিন রংকে কুৎসিত করে দিয়ে জানলার নীচে ইটালিয়ান মার্বেলের ওপর কারা আলকাতরা দিয়ে লিখে রেখে গেছে—

"কমিউনিস্টরা চোর"

কমিউনিস্টদের নিন্দে করার এই প্রক্রিয়াটা শকুন্তলার কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না; সেনের পাশে বসে শরীরের ভেতরটা ওর ক্রমাগত গুলিয়ে উঠতে লাগল—

"ইস্—মাগো!"

কাফে-ডি-মনিকো নয়, কফি হাউসও নয়—শ্রীদুর্গা কেবিন। অর্থাৎ চায়ের দোকান। হুড়মুড় করে কতগুলি পুরুষ, অভিভাবকহীন ভদ্রমহিলা সেখানে উঠে মেসের আড্ডাবাজ ছোকরাদের থ বানিয়ে দিলেন। পর্দা কই? জায়গা কই? মোলায়েম অন্তরাল কই? তথাপি ওরই ভেতরে, ভীড়ে, একটি টেবিল ও কয়েকটি চেয়ার অধিকার করে ওদের বিন্দুমাত্র বিব্রত দেখাল না। আশেপাশের গণ্ডগোলটা কিন্তু সহসা থেমে গেছে।

রেখা হিসেব করছিল—

"তিনটে রুমালের দাম পাওয়া গেছে, দুটো কিন্তু বাকী আছে মিনু। আর ব্লাউজ? ব্লাউজ কটা বিক্রি হল?"

"সুমিতা জানে, এই সুমিতা? সব কটা ব্লাউজই তো তোর কাছে ছিল?"

কানের দুই পাশে একটা অস্পষ্ট অনুভূতিতে সুমিতা বুঝতে পারছিল

কয়েক জোড়া পুরুষদের চোখ তার ওপর এসে পড়েছে। ইচ্ছে হচ্ছিল ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নেয় একটু; কিন্তু রেখা রায় হাসবে। সুন্দরী নয় বলে ওর পক্ষে হাসা হয়তো সহজ।

যতোখানি প্রয়োজন নয় তার চেয়েও বেশী মনোযোগ দিয়ে সুমিতা তার মোড়কের ব্লাউজগুলি গুনে ফেলল।

"এগারোটা ব্লাউজ বিক্রি হয়েছে; বিক্রি করা কি কম হাঙ্গাম! এব্‌ড়োখেব্‌ড়ো সেলাই—আনাড়ী অপটু মানুষ নিয়ে কারবার—তবুতো নরেশবাবুর বৌ আমাদের খুব উৎসাহ দিলেন। উনি মোটে বিশ্বাস করতেই চাইছিলেন না যে ডেস্‌টিটিউট মেয়েরা এসব করতে পারে—রেখাদি, কই চায়ের অর্ডার দিলে না? আমি বললুম, হ্যাঁ আমরা যে ওদের শিখিয়ে নিচ্ছি; চলুন না আপনাকে একদিন দেখিয়ে আনি। উনি বললেন—"

সন্ধ্যের দিকে কমলা এবং মালপাড়ার তিনটে মেয়ে ঝুড়িভর্তি পচা চাল নিয়ে গাঁয়ে ফিরছিল। অসুখে না ভুগলে কমলা নাকি অতোখানি লুভী হয়ে উঠতো না। মুঠো মুঠো পচা চালগুলো মুখের মধ্যে পুরে হাঁটতে হাঁটতে কমলা চিবিয়ে খাচ্ছিল। অর্ধেকটা গিলে ফেলছিল আর বাকীটা ফেলে দিচ্ছিল চিবিয়ে চিবিয়ে; "থুঃ থুঃ—হ্যাঁ গো মাসী, পচা—এ আর রান্না করে ভাত খেতে হবে নাকো।" তারপর আবার মুঠো করে চাল নেয়। মুখের মধ্যে পুরে চিবোয়। অর্ধেকটা গিলে ফেলে।

গয়লা বৌ নেই। সেই যে লোকটার সঙ্গে কোথায় গেল আর ফেরেনি।

সাড়ে সাতটার সময় যে ট্রামটা এসপ্লানেড থেকে বালীগঞ্জে যাচ্ছে, তাতে ভীড় নেই ; অর্থাৎ এখনও কেউ দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন না ; স্যুট, ধুতি ও পাঞ্জাবীর ইস্ত্রিতে শুচিবায়ুগ্রস্ত প্রাধান্য। মধ্যবিত্ত কয়েকটি ভদ্রলোক। চুল ও শাড়ীর আধুনিক ফ্যাসানের ডামির মতো দুজন মহিলা। যাঁরা সামনের দিকে বসেছেন, কিছুতেই পেছনে অথবা পাশে তাকাবেন না তাঁরা। যাঁরা পেছনকার পাশকে সীটে বসেছেন, তাঁদের একটু অসুবিধা। বাঁ দিকের ভদ্রলোকেরা সামনে তাকালে ডান দিকের ভদ্রলোকদের মুখের ওপর চোখ পড়ে ; ডান দিকের ভদ্রলোকরা বাঁ দিকে। পরস্পর পরস্পরের দিকে, সুতরাং অনতি-উর্ধ্ব তীর্যকভাবে প্রেরণাহীন তাকিয়ে থাকেন। একটু মোটা ভদ্রলোকটি খবরের কাগজে মুখ লুকোন ; একটু রোগা ভদ্রলোকটির ঠোঁটের দুই পাশটা প্রসারিত হয়ে চিরস্থায়ী হাসির মতো দেখায়। তৃতীয় একজন দুই হাঁটুর ওপর দুই হাত এমন ভাবে রেখেছেন যে মনে হবে এইমাত্র উঠে দাঁড়াবেন তিনি। সারি সারি চোখগুলোয় নাগরিক ঔৎসুক্যহীনতা। এখানকার কনডাক্টার আশ্চর্য রকম কম কথা বলতে পারে। এখানকার কনডাক্টার যাত্রীর সঙ্গে কলহ করে মার খায়নি কোনদিন। ওকে ডেকে অযথা দুটো আলাপও করেনি কেউ।

সৌখিন কাগজের মতো ভাঁজ করা নীলাভ আবহাওয়া একটু।

সৈন্য। একের পর এক সৈন্য শুধু। মসৃণ শানের ওপর তাদের একঘেয়ে বুটের শব্দ অন্ধকারে থস থস করে কেবল।

ভীড়ের একপাশে চৌরঙ্গীর বিখ্যাত বিলিতি হোটেলের থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগল না সমুদ্রপারের কালো মানুষটার। পকেটে হাত দিয়ে দেখল, কটা নোট আছে : ইয়াস সা—

জায়গাটা চেনা। রোগা ফিরিঙ্গি মেয়েটা সম্ভাষণ জানাল অতো বড়ো শরীর নিয়ে লোকটা কী আশ্চর্য ধীরভাবে হাঁটে ভাল লাগে।

"বসো।"

ক্যান্টিনের মদে নেশা হয় না; কিচ্ছু হয় না; কুৎসিত রোগা মেয়েটাকে কিছুতেই সুন্দর দেখাচ্ছে না। পকেট থেকে টাকা বার করল।

"মদ আনাবে?"

ভুস্ করে ঢুকে পড়েছিল ফিটফিটে চেহারার বছর সাতেকের একটা ছেলে। অন্য সময় হলে একটু হাসতো; একটা কদর্য ইয়ারকি করতো আগন্তুক লোকের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে। কিন্তু অতো বড়ো চেহারার নিগ্রোটাকে দেখে সত্যিই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। দরজায় এবার একটু ভীত ও ভদ্র টোকা পড়ল।

"জোসেফ এসেছিল?"

"চলে গেছে।"

তিন গ্লাশ মদ খাওয়ার পর কালো মানুষটা জিজ্ঞেস করল ঘড়ঘড়ে গলায়—

"ওরা কারা?"

একটু ইতস্তত করল মেয়েটি—"আমার মেজ ছেলে, আর আমার মা—।"

নেশা হয় না; মমতা হয় কুৎসিত মেয়েটা এত রোগা! মোটা চ্যাটালো হাত দিয়ে আদর করল।

"টাকা চাই তোমার? এই নাও। ভাল করে খাওয়া দাওয়া করো।" —মদ ঢালল।

"তুমি খুব ভাল মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে। জেসাস্ তোমাকে মোটা করে দেবে—" কেমন কান্না পাচ্ছিল কালো মেয়েটার, ভয় মেশানো চাপা কান্না; কোন কারণ নেই এমনি। কোন কারণ নেই এমনি বলে বসল—

"জানো আমরা শাদা চামড়াদের ভীষণ ঘৃণা করি—"

বোকা চোখে তাকালো। দুই ঠোঁটের পাশে চেপে 'বর্‌র্' করে একটা শব্দ করল। আবছা অন্ধকারে চোখের শাদা অংশটা ভীষণ উজ্জ্বল!

"তোমরা তো স্বাধীন হয়ে যাবে যুদ্ধের পর—তোমাদের দেশের লোকেরা কী করছে এখন?" মদ ঢালল। লম্বা মোটা হাত বার করে দেখালো—"কী গরম! পুড়ে গেছে চামড়া—" ঠোঁটের পাশ দিয়ে 'বর্‌র্' করে শব্দ করল: "সাতাশ মাস দেশছাড়া। দেশে তোমার মত আমার একটা মেয়ে আছে, বিয়ে করে নি—রাঁধুনিগিরি করছে—বুঝেছ? তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে—এক গ্লাশ মদ দাও ব্যস—তারপর চলে যাবো, কিছু চাই না আর—"

মাতাল হলে লোকগুলো এত আবোল তাবোল বকে—

আউট অব বাউণ্ড্স্!

নীলমনি কম্পোজিটর তার চটি বইগুলো নিয়ে বেরিয়েছে। চার পয়সা করে দাম—যা বিক্রি হয়। পরিশ্রম একটু বেশী পড়ে বই কি; কিন্তু বেঁচে থাকতে গেলে অমন পরিশ্রম না করে কি চলে? লম্বা রোগা মানুষটা চাঁচা-ছোলা গলায় আবৃত্তি করে:

"আট আনার মাছ চার টাকা হল
মেছুনি নাড়ছে মুখ,
গিন্নী রেঁধেছেন বেগুনের কালিয়া
বাবু মুখে দেন সেইটুক—"

নিবু নিবু দোকানগুলোয় উদ্বৃত্ত লোকজনেরা হাসে ; তারিফ করে ; ক্লান্ত নীলমনিও তাই উৎসাহিত হয়ে ওঠে। রানীকে নির্বাসন দেবার আগে যাত্রার দলের রাজার মতো ফাঁকা রাস্তাটায় পায়চারি করে। দর্শক-মনস্তত্ত্বে অভ্যস্ত চতুর নটের মতো উৎসুক লোকদের অপেক্ষা করায় ; তারপর সহসা আরম্ভ করে—

"দু আনার আলু এক টাকা হল—
কচুর ডালনা রাঁধো ;
খেতে বসে শুধু নুন দিয়ে খান
আহা মুখখানি কাঁদো কাঁদো।"

নীলমনি কম্পোজিটরের কবিত্ব-শক্তি, চুরি করা সময় ও কাগজের টুকরোয় চার পয়সা দামের বই হয়ে বিক্রি হচ্ছে। "কিনুন না স্যার—"

ঠুলি-পরা বাল্‌বের তেরছা আলোয় গেটের ওপর ইংরেজী সাইনবোর্ডের খানিকটা নজরে পড়ে :

হিয়ার ইজ্ এ্যান্ ইণ্ডিয়ান কুলি—
অন হুম্ উই রিলাই
হি কেয়ারস্ নট্ ফর দি ওয়ার
স্টিল্ লেস্ ফর্ সাপ্লাই
কীপ্ হিম অন্ দি বল্—

এই একজন ভারতীয় কুলি—লড়াই বোঝে না, রসদ সরবরাহের প্রয়োজনের জ্ঞান নেই—চালু রাখো ওকে—

মিলিটারি ব্যারাক। অধিবাসীদের জরুরী পরোয়ানা দিয়ে বাড়ীটায় মিলিটারি লোকেরা এসে উঠেছে। তিনতলার একটা অর্ধ-আলোকিত

খোলা জানলা দিয়ে বিদেশী বাজার হট্টগোল এসে আছড়ে পড়ে নির্জন অন্ধকার রাস্তাটার ওপর।

সেই পাগলটা।

অন্ধকারে আপন মনে হাঁটছে।

হে—হে—

তেতলাব জানলা থেকে কয়েকজন মাতাল উঁকি মেরে দেখল বাইরে। তারপর কয়েক টুকরো পাউরুটি ছুঁড়ে ফেলে দিল ফাঁকা রাস্তাটার ওপর। ছায়ার ভেতর থেকে নিস্তব্ধভাবে কারা বেরিয়ে আসে তখন। আশে পাশে চারদিকে চেয়ে দেখে পুলিশ আছে কিনা।

নিঃশব্দে দ্রুত কুড়িয়ে নেয় টুকরোগুলো।

হা—হা—হা—

তেতলার জানলায় মাতালদের হাসি শোনা যায়। মজা পেয়ে আরো কয়েকটা টুকরো দিয়েছে ওরা—

ছায়ার সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে এঁদো গলির লাল শাড়ী-পরা মেয়ে। লাল শাড়ী খয়েরী শাড়ীর সঙ্গে গল্প করে :

"সকালে দল বেঁধে ওরা গঙ্গাচ্চানে গেল ; আমি বললুম ওলো দাঁড়া—" খয়েরী শাড়ী নীল শাড়ীর পাঁজরায় ধাক্কা দিয়ে বলে—

"মাইরী, দুটো চপ্ ঢাকা দিয়ে রেখেছি কোণে— সে ইঁদুরে কী করছে কে জানে।" বলে হাসে।

লাল শাড়ী একটু নড়ে চড়ে ; ফুটপাথের ওপর পা দিয়ে একটু ঘষে। চাবির শব্দ করে আঁচলটা হাতের ওপর টেনে নেয় ; আবার কাঁধের ওপর ফেলে।

হাঁটতে গেলে গোড়ালির কাছে কাপড়ে পৎ পৎ শব্দ হয়। আস্তে

আস্তে এগিয়ে গিয়ে মোড়ের পানের দোকানের সামনে দাঁড়ায়। আশে-পাশে তাকায়। পান কেনে; দশ মিনিট ধরে। পানওয়ালা জানে।
রাত বাড়ে।
"চুন দাও।"
পেণ্টুর বাবা লাল শাড়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।
"কি গো আমায় কি মনে ধরলো না—"
চাপা বিদ্বেষে ফিস্‌ফিস্ করে নীল শাড়ী রসিকতা করে। খয়েরী শাড়ী ফুটপাথের ওপর পা ঘষে।
"মাইরী, ছুটো।চপ ঢাকা দিয়ে রেখে এসেছি কোণে। ইঁদুরগুলো—"
ডাইং ক্লিনিঙের ম্যানেজার।
রাত বাড়ে।
"চুন দাও—" পানওয়ালা জানে।

রাত্তির দশটার সময় অভিজাত পাড়ায় ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে শকুন্তলা আয়নার মূর্তিটাকে প্রশ্ন করে—
"এখন কী করবো?"

আর তারপর প্রায় সাড়ে দশটায় হৈ হৈ করে একদল লোক বেরিয়ে এল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট থেকে। সভা ভেঙেছে। কলেজ স্কোয়ারে তুজন লোক পাশাপাশি তুটো বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমিয়ে ছিল। গণ্ডগোলের ধাক্কায় একটা লোক উঠে বসে তুই হাতে চোখ কচলালে একবার।

কাঠ বোঝাই হয় নৌকায়। আসামের পাহাড় জঙ্গলের কাঠ। কাঠ নয় পয়সা। কারবারী মানুষদের নৌকা স্তূপাকার হয়ে ওঠে। যখন আর আঁটে না, তখন দুই পাশে বেঁধে ভাসিয়ে দেওয়া হয় জলে। আসামের নদী মোচড় খেতে খেতে বাংলায় এসে পৌঁচেছে। খরা স্রোত ঢিলে হয়ে থতিয়ে গেছে ক্রমে ক্রমে। লোকে নদীর নাম দিল যমুনা। হাট আর গঞ্জ আর স্টিমার স্টেশন। এপাশে কাঠের আড়ত। শাদা চিক্‌চিকে বালির ওপর কারবারী লোকের নাম খোদাই করা কাঠগুলো মুখ গুঁজে রোদ পোয়ায় কুমীরের মতো। বালির সীমানা পেরিয়ে কালো পলিমাটির অন্তর। ধান, পাট, মুগ আর মসুরি আর সরষে বোনা হয় সারা বছর ধরে। কাঁচা আর পাকা ফসল কেটে নেয়া মাঠের ওপর যমুনার সোঁদা হাওয়া লুটোপুটি খায়।

বালির ওপর কাঠগুলো খালাস করে দিয়ে বড়ো বড়ো নৌকাগুলো অপেক্ষা করে। হাট থেকে বেঁটে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে সোনা-রঙা ধান

গঞ্জের গুদামে পৌঁছে দিয়ে যায় মানুষ।   গৌর সাহার কর্মচারীরা ধান মাপার তদারক করে ; বস্তা সেলাই করার, নৌকা বোঝাই করার। তারপর ভাটির দেশে যাবে নৌকা।
ধান পাট বিক্রির টাকা খুঁটে বেঁধে স্টিমার ঘাটে ভীড় করে দাঁড়ায় মানুষ ; নুন আসবে, চিনি আসবে, কেরোসিন তেল আসবে ভাটির দেশ থেকে ; আর কিছু কাপড়।
আর ওষুধ।

জীবনযাত্রাব রীতি এই রকমই ছিল।   কারবারী লোকেরা পয়সা করে, তাই গবিব গেরস্ত লোকেরা পেট পুরে খেতে পায় দু বেলা। কাঠের আড়ত আস্তে আস্তে গঞ্জ হয়ে ওঠে। খাটুনি দিতে পারে এমন লোকজন এসে জোটে। নদীর একটা বাঁকে ঘর বাড়ী ভেঙে গেছে যাদের তারা এসে ঘর বাঁধে। দোকানী দোকান খোলে। নৌকার ভাল কারিগররা খেটে খেটে সময় পায় না। সন্ধান পেয়ে বিহারের করাতীরা ঘোরাঘুরি করে। দল বেঁধে খেটে দিয়ে যায় নগদ মজুরিতে।
কিন্তু ক্রমশ উলটে গেল সব কিছু। কারবারী মানুষদের রোজগার বেড়েই যাচ্ছে তবু মানুষের এমন হাল হচ্ছে তাজ্জব। নৌকা মারার আইন করেছিল সরকার—মানুষ-মারা আইন। বুঝতে কষ্ট হয়নি। কিন্তু আইন তো উঠে গেছে কত্তা ?
নমশূদ্র পাড়ার চাষারা জমি বেচে কোথায় কোথায় পালিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এল। মাত্র বারো আনা লোক কালো পলিমাটির ঢেলা তুলে নিয়ে লুব্ধ দুই হাতের তালিতে গুঁড়ো করে করে বললে, মাটি নয়,—সোনা। সোনা ফলে এ জমিতে। ধান, পাট, মুগ, সরষে। যমুনার তোড়ে ফাটল-ধরা পাড়ের মতো দুই ঠোঁট হাসির মতো একটা নির্লজ্জ ভঙ্গীতে

কাঁক করে হাঁপায়—আমাদের একটা বাঁচবার হদিস দেন, কত্তা।

তবু একটা ভারসাম্য খুঁজে পেতে হয় মানুষকে। মাঠে মাঠে ছড়িয়ে পড়ে লাঙল দিতে হয়; চেয়ে চিন্তে যোগাড় করে নিয়ে আসতে হয় নৌকার বায়না। বিগত দুঃখ যন্ত্রণার আঘাতটা ঘাড়ের ক্ষতের ওপর জোয়ালের চাপের মতো স্বাভাবিক সহনশীলতায় লুকিয়ে থাকে। মনে হয় এমনিভাবেই বেঁচে এসেছি চিরকাল। শুধু যদি এমনিভাবেই বেঁচে যেতে পারতাম।

মাঝে মাঝে থমকে ভয় পেয়ে তাকাতে হয়। ভিনদেশী এক ফকির বাঁকানো কালো লাঠিটা আকাশের দিকে উঁচিয়ে বললে—শুনতে পাচ্ছ? আশেপাশের জন কয়েক লোকের মুখ শুকিয়ে গেল, শুনতে পাচ্ছে তারা। যমুনার সোঁদা বাতাসে কিসের কান্না।

সাপের মতো ভয়ংকর লাঠিটা তুলে আকাশের অন্য একটা কোণে দেখাল, দেখেছ?

দেখেছে। গাদা গাদা শকুন উড়ছে আকাশে। মড়কের অগ্রদূত ওরা। যমুনার কোন একটা বাঁকে মরা গরু আর মানুষের মাংস খাওয়ার জন্যে সাঁই সাই করে উড়ে আসছে।

শেতলার দয়া। ওলাবিবি। ম্যালেরিয়া। আর জ্বর—সে জ্বরের কোন নাম নেই; মানুষ মরে গেলে তবে চেনা যায় তাকে।

পট পট করে মরে গেল নমশূদ্র পাড়ার তিনটে মানুষ!

তারপর মুসলমান পাড়ার দুজন: বুড়ো কাদের মিঞা, নেওয়াজ।

নদীর পাড়ে রোগা দুর্বল হাতে হাতুড়ির বাড়ি পড়ে—কাজ এগোয় না। মাঠে মাঠে প্রথম বর্ষার দামী সময় অযথা ক্ষয়ে যায়।

সাতখানা গাঁ পেরিয়ে বড়ো হাট থেকে তিনকোনা কাঠটা কিনে নিয়ে আসছে এস্তাজ। অসুস্থ ছেলেকে বুকে করে যেভাবে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের দাতব্য চিকিৎসালয়ে নিয়ে যায় তেমনিভাবে অত্যন্ত মমতায় জড়িয়ে ধরেছে কাঠটাকে। সাতশমনী নৌকার গলুই বানানো হবে ওতে। সেরা কারিগরের চোখ বেছে বেছে পছন্দ করেছে ওটাকেই।
বালির ওপর কাঠটাকে নামিয়ে একটু বসে এস্তাজ। হাঁপিয়ে গেছে। দূরে কয়েকজন লোক একটা নৌকা ঠেলছিল। কাজ করার ফাঁকে এস্তাজকে দেখে সেলাম করলে তারা। এস্তাজ সেলাম ফিরিয়ে দিল। পুরনো লোক বলে এখনো সম্মান পেয়ে আসছে এস্তাজ।
একটুখানি বিশ্রাম করে আবার উঠে পড়তে হবে তাকে। যমুনার জলের ওপর ছায়া সরছে। সূর্য ডুবে যাওয়ার পরেকার স্বচ্ছ ছায়া। সন্ধ্যের আগেই বাড়ী পৌছনো ভাল।
কিন্তু উঠল না ও। বসে থাকার মতো একটা কুড়েমি পেয়ে বসেছে ওকে। হাত দিয়ে শাদা বালিগুলো নেড়ে নেড়ে দেখে কেমন ঠাণ্ডা লাগছে। অনেক হাঁটার জন্যেই বোধ হয় গলাটা শুকিয়ে এসেছে। একটু জল খেতে পারলে ভাল হত। কিন্তু বালি ভেঙে নদীর কিনার পর্যন্ত যেতে ইচ্ছা হয় না। দুই হাঁটু জোড় করে কুঁকড়িয়ে বসে রইল এস্তাজ। তারপর বুঝতে পারল ও কাঁপছে। শীত করছে। হি হি করে একটা কাঁপুনি বুড়ো হাড়ের ভেতর থেকে উঠে আসছে কেবলি।
বড়ি পাওয়া যাবে না তবু অসুখ আর মহামারীর সঙ্গে লড়াই করতে হবে মানুষকে। বেঁচে থাকতে হবে। বুকের ভেতরকার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি নিষ্করুণ মহামারীর মাথা খুঁড়ে পঙ্গু হয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ উপায় মিলে গেল একদিন।
কুইনিন।

অনেক দিন আগে, লড়ায়েরও আগে বড়ো মতো চৌকো টিনের বাক্সের মতো এক হাওয়া গাড়ী বিশ মাইল দূরে পাকা রাস্তার সীমানায় থানার ময়দানে থেমেছিল। নানারকম ছবি আঁটা ছিল তার গায়ে। কলের গান বাজিয়ে বাজিয়ে লোক জড়ো করত। মোটা চোঙের ভেতর দিয়ে তারপর জীবন্ত মানুষের গলা শোনা যেত। বক্তৃতা দিত ওরা। সরকারের লোকের ভদ্র কথাবার্তা আর শিক্ষিত উচ্চারণ কেউ ভাল করে বুঝতে পারেনি।

কিন্তু হাত পেতে পেতে শাদা চৌকো বড়িগুলো নিয়েছিল ওরা। বিষ নয়ত ? হারামের রক্ত দিয়ে তেজী করা হয় নি তো ওগুলোকে ? না। খুব ঠাণ্ডার দেশ আছে এক পাহাড়ের ওপর। সেইখানকার গাছ গাছড়া থেকে বিলাত-ফেরত মানুষেরা দাওয়াই বানিয়েছে। এক রকম মশা আছে, শুঁড়ে করে তারা অসুখ নিয়ে আসে। তাজা মানুষের চামড়ায় কামড় দিয়ে রক্তে সেই অসুখ মিশিয়ে দিয়ে যায়। কেঁপে কেঁপে জ্বর আসে মানুষের।

তাজ্জব ! কিন্তু এ দেশে সে অসুখ নাই।

সরকারী লোকটা বিশ্বাস করেনি। শাদা বড়িগুলোর শিশিতে টোকা দিয়ে বলেছিল—চিনে রাখ এ জিনিস। একমাত্র ওষুধ, আর নেই। কিন্তু সে তো অনেকদিন আগেকার ঘটনা। ক্রোশের পর ক্রোশ হেঁটে গাঁয়ের মানুষেরা গিয়ে জোটে ডিস্টিক্ট্ বোর্ডের ডাকতার থানায়। ভয় পায় না আজকাল। নির্ভয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় উৎসুকভাবে—কয়েকডা বড়ি দেন ডাকথারবাবু !

বড়ি ? লড়াই বেধেছে কিছু পাওয়া যাবে না আর। ঢাক ঢোল বাজিয়ে পূজো দিয়ে এল নমোরা। মা এসেছেন, মা।

নমশূদ্র পাড়ার একটি বৌ রাত্রে স্বপ্ন দেখেছে, মা এসেছেন।

তোর সোয়ামী অসুখে ভুগছে, ক্ষেতে লাঙল দিতে হবে না? বীজ ফেলতে হবে না? তিরস্কার করে মা জিজ্ঞেস করলেন।

চওড়া লাল পেড়ে শাড়ী পরনে। মাথায় জ্বল জ্বল করছে সিঁদুর। ঝকমকে সোনা-বাঁধা শাঁখা। চাবি-বাঁধা আঁচলটা পিঠের ওপর লেগে রয়েছে। জমিদার বাড়ীর মেজ বৌ-এর মতো মুখের আদল।

আহা দেবীমূর্তি। সেই মূর্তি দেখে দেখে কান্না পেল নমোদের বৌটির। মায়ের আলতা রাঙা পা দুটি জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললে—কি করব মা ঠাকরুণ আকালের পর থেকে অসুখে ভুগছে মানুষটা, ক্ষেতে লাঙল দিলে না; জোতের বলদটা মরে গেল, ধারধুর করে আরো একটা কিনবে তাও না। আষাঢ় পড়ল। ধানগাছের চারা গোড়ালি সমান উঁচু হয়ে ওঠে এতদিন। মাঠে মাঠে আগাছা তুলে ফেলে নিড়ানোর হিড়িক লেগে যাবে। খেটে খেটে বৌ-ঝিরা নিশ্বাস ফেলার ফুরসুত পাবে না, কিন্তু অসুখে ভুগছে মানুষটা; কাতরাচ্ছে, গালাগালি দিচ্ছে। হু হু করে কেঁপে জ্বর আসছে—

মা হাসলেন। দয়া হলে দেবী হাসেন। আর দয়া হবে, অনেক আগেই তা টের পেয়েছিল বৌটি। হেসে মা বললেন—আমার পূজো দে। তোরা যে জমিটুকু চাষ করছিস সেটা পেরিয়ে উত্তর দিকে ডান হাতি একটা ডোবায় জল জমেছে এখন।

কেঁদে কেঁদে বললে বৌটি—হ্যাঁ মা আছে। গরমের দিনে হাল বইতে বইতে বেয়াদব মোষগুলো বারণ না মেনে সেই খাটালের কাদায় এসে মুখ উঁচু করে গা ডুবিয়ে আরাম করে। সেখানে এখন বর্ষার জল জমেছে, মা, ঘোলা জল।

সেইখেনে তোর সোয়ামীকে পাঠিয়ে দে। পূব মুখ হয়ে তিনটে ডুব দিক, সেরে যাবে।

নিকানো উঠোনের ওপর আলতা-পরা পায়ের ছাপ এঁকে চলে গেলেন মা। স্বপ্নের ভেতর কেঁদে কেঁদে অনেক চোখের জল ফেললে বৌটা—ওগো ঠাকরুণ, তাই বলব মানুষটাকে। অসুখে ভুগে ভুগে কি শরীর হয়েছে যোয়ান লোকটার।

অন্ধকারে ঘুম ভেঙে অনেকক্ষণ চোখ বুজে বসে রইল বৌটি। দেবতা এসেছিলেন এখানে। দেবতার তিরোধানের পর পৃথিবীর সমস্ত ভয় থম্‌থমিয়ে রয়েছে এই অন্ধকারে। গড় হয়ে প্রণাম করল বৌটি, ঠায় বসে রইল সূর্য না ওঠা পর্যন্ত।

সকাল হলে স্বামীকে ধরে নিয়ে গেল সেই ডোবাটার কাছে। ডুব দিয়ে আনল। কাউকে বলেনি। স্বপ্নের কথা না বললে তবে ফলে। তারপর স্বামীর অসুখ ছেড়ে গেলে বলে বেড়াল পাড়ার লোককে।

উত্তেজনায় ঢাক ঢোল বাজিয়ে পুজো দিয়ে এল পাড়ার লোকজন। লাল শাড়ীপরা টকটকে সিঁদুর-কপালী মেয়েটি আর কেউ নয়, গঙ্গা।

ম্যালেরিয়া।

কাঁথা-চাপা এস্তাজ ভালুকের মতো কাঁপে। ঘরের মধ্যে অভাগী মেয়েটা বারবার করে ঘোরে—আরো চেপে ধরবে ও? কি খাবে বাজান? ওষুধ বিষুদের একটা বন্দোবস্ত করা উচিত—

একডা পান দিব্যার পারিস? মুখডা য্যান্ বিষ—ওষুধপত্তর নয়, একটা পান চায় এস্তাজ। কি হবে ওষুধ খেয়ে; এ অসুখ ওষুধে সারে না।

ফকুরাক্ পাঠাও না ক্যান ডাকথারখানায়, সান্ত্বনা দেবার মতো করে সায়েরা বলে। অভাগী মেয়ে সায়েরা।

জ্বরের মধ্যে ককিয়ে ককিয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয় এস্তাজ, নৈক্যার বায়না নিচ্ছি যে—

তিন দিন পরে উঠে দাঁড়ায় এন্তাজ। অভাগী মেয়েটার চোখের ওপর স্থির আতঙ্কের পর্দাটা একটু কেঁপে ওঠে—শল্লে তাগদ নাই, নড়বার পারো না, পা বারাও যে ?

বায়না নিছি না ? দুর্বলভাবে বলে এন্তাজ।

সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসে দ্বিগুণ জ্বর নিয়ে।

আজামশায়ের কাঁথাব তলে আস্তে আস্তে পা ঢুকিয়ে দেয় সায়েরার ছেলে। টস্ টস্ করছে মুখটা, চেহারাটা নরম কচি দেখাচ্ছে। উঠতি উত্তাপের প্রথম ধাক্কায় ধুলোমাখা গায়ের খসখসে পালিশটাও হয়ে উঠেছে মসৃণ।

শীত করত্যাছে দাদু। মহরমের কাহিনীটা কও, ঘুম আসি।

নওলা বর্ষার ভ্যাপসা গরমেও শীত করছে নাকি ছেলেটার ? এখন খেলা কবে বেড়ানোর সময়। করাতীদের দড়ি বাঁধা বাঁশের ডগায় চেপে মেঠো সুবে গান ধববে পাড়াব ছেলেবা। স্টিমার ঘাটে গিয়ে জুটে লোকজনেব যাতায়াত দেখবে। চবের মাঝে অন্য লোকের গরু চরাতে নিয়ে যাবে—তা না ভাল ছেলের মতো শুয়ে পড়ছে কেন।

সায়েরা তোর ছাওয়ালের গা ডা দেখ, জ্বর আল বুঝি—

এন্তাজের নিজের হাতে কোন সাড় নেই। খাটিয়ে মানুষের চামড়া খুব কড়া। উত্তাপের তাবতম্য ধবা পড়বে না তাতে।

ঘাট থেকে ফিরে এসে ছেলেব গায়ে হাত দিয়ে সায়েরা বুঝতে পারল। খুব বড়ো বড়ো সর্বনাশ, নিজের জীবনেই যা ঘটবে, তার সূচনা বাইরের লোকের চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু সায়েরা জানে।

সাইর‍্যা যাইবেনে, জ্বরের ঘোবে পাশ ফিরে শুয়ে অভাগী মেয়েটাকে সাহস দেয় এন্তাজ, একডা পান দিব্যার পারিস ?

গরিব লোকের সমগ্র জীবনের বিস্বাদ জিভের ওপর নিয়ে কফিয়ে

উঠতে চায়। আগুনে ঘর পুড়ে গেলে যারা কাঁদতে পারে না, তাদের মতো দুই চোখে তাকিয়ে.থাকে মায়েরা। বাপের কথা কানে যায় না, তাকিয়ে থাকে।

ফকর‍্যা এসে দাওয়ার উপর ঠক্ করে ওষুধের শিশিটা নামিয়ে রাখে। ফকর‍্যার মনটা ভাল। স্টিমার ঘাটে খালাসীর কাজ করে ফিরে আসার সময় দাতব্য চিকিৎসালয় ঘুরে এসেছে। অনেকখানি হাঁটতে হয়েছে সেই জন্যে।

খাইয়্যা বালো অও এস্তাজ চাচা। ফকর‍্যা ব্যঙ্গ করে। করবে, না? প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল তাই লুকিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে ও। এনামেলের এক গামলায় লাল রঙয়ের জল গোলা রয়েছে। সেইটেই নাকি ওষুধ।

বালো অও তো বুঝ্ ফ আল্লা বালো করছে।

আল্লা?

ঢং ঢং ঢং——

কাঁসর বাজছে। নমশূদ্র পাড়ার লোকজন দলে দলে ডোবার ঘোলা জলে ডুব দিয়ে ফিরছে। অসুখে ভুগবে না আর কেউ। বুড়ো বুড়ো মানুষেরা তাকিয়ে দেখল ধোয়া-নীল এক টুকরো মেঘ ক্রমশ বড়ো হচ্ছে। বড়ো হয়ে সমস্ত আকাশ ফেলেছে ঢেকে। অজস্র বৃষ্টি নেমে কালো পলিমাটিকে ধান গাছের চারার জন্যে প্রস্তুত করে রাখবে।

ওরা যাদের বিশ্বাস করে সেই সব দেবতারা ওদের রক্ষা করবে। মাঠে মাঠে ছড়িয়ে দেবে আশাতীত শস্য।

ঘুমের ঘোরে ভুল বকে এস্তাজ। কাজ করতে হবে না, কাজ? সাতশমনী নৌকা বানানো। আগুনের আঁচ দিয়ে পাটাগুলো ঠিক মতো

ঝাঁকিয়ে নেয়া। ঠুক-ঠুক-ঠুক নদীর পাড় থেকে মিষ্টি শব্দ। শাদা চিক্‌চিকে বালি, ঝক্‌ঝকে শাদা জল। ওস্তাদ কারিগরের তদারকে নৌকার খোল। ভিনদেশী কারিগররা হিংসে করবে নৈপুণ্য দেখে। শাদা ভিজে বালি। চেনা লোকেরা সেলাম করে।—আলেকুম সেলাম। নৌকা ঠেলো, নতুন নৌকা জলে ভাসবে। নীল লুঙ্গি গুটিয়ে নাও উরুর ওপর। খুলে ফেলো ক্ষারে কাচা ধবধবে গেঞ্জিটা। সায়েরার হাত ভাল, ওব হাতে কাপড় চোপড় পরিষ্কার হয় বেশী। খোলা বুকে অজস্র লোম, এখন শাদা। গত দেড় বছরেই বুকের লোম শাদা হয়ে পেকে গেল। কারিগর, তুমি হাত লাগাবে ?

হু লাগাও।

বালিব ওপর দিযে অতো বড়ো ভারী নৌকা ঠেলে নিয়ে যাওয়া চলে না। কয়েকটা বাঁশ সাজানো তলে। এখন একদিক দিয়ে ঠেলা মারতে হবে। অনেক চেষ্টায় নৌকা একটুখানি সরবে জলের দিকে। আবার ঠেলতে হবে অন্যদিকে। বাঁশগুলো প্রয়োজন মতো গুছিয়ে নিতে হবে একটু। আবার ঠেলতে হবে।

বোল দাও।

ও বোলরে বোলা, হেঁইয়ো

ও বোলবে বোলা হেঁইয়ো—

হাত লাগিয়ে পিঠ লাগিয়ে ভেজা বালিতে শক্ত দুই পা গেদে। পরিশ্রমে একদল মানুষ ঘেমে পিছল। জলে ভাসাতে হবে নৌকা। একদল মানুষ একজোট হয়ে লড়ছে নৌকার আপত্তির বিরুদ্ধে। কিন্তু মানুষের একজোট ইচ্ছাব কাছে হেরে যাবে নৌকা।

মারেরে যোয়ান হেঁইয়ো

সরছে বুঝি হেঁইয়ো—

এন্তাজের বুকের লোম শাদা হয়ে গেছে। বোল দেয়ার সময় এন্তাজকে উদ্দেশ করে বোল বাঁধে তামাসা-প্রিয় লোকেরা—

ওরে কেউ বুড়্যা না, হেঁইয়ো

সবাই যোয়ান, হেঁইয়ো

সরছে, সরছে !

ওরে গেছেরে ছাইড়্যা, হেঁইয়ো

হেঁইয়ো, হো, হুড্যা, হুড্যা, হুড্যা—

নদীর ঘাটে গিয়ে বসে সায়েরা। কলসীটা ভরে নিয়ে দুটো ডুব দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে চায় না অভাগী মেয়েটা। ওর চোখের ওপর স্থির আতঙ্কের দৃষ্টিটা ধীরে ধীরে গাঢ় ঘন একটা কুয়াসা হয়ে কাঁপে। নদীর ঘাটে অনেকখন বসে থেকে থেকে একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যায় সায়েরা।

সঙ্গের মেয়েরা উঠে যায় একে একে। নির্জন হয়ে যায় যমুনার ঘাট। তখন অস্ফুট গলায় কি বলে সায়েরা। আপন মনে বলে। নৌকার ঘাটে গহনার নৌকাগুলোর দিকে এক পা এক পা করে এগিয়ে যায়। অনেকখানি ঘোমটা টেনে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার মতো ভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর 'একসময় জিজ্ঞেস করে—আসাম থেকে আসছে নৌকা ?

একজন ভালমানুষ বুড়ো মাঝি অবাক হয়ে উঠে আসে, হাঁ বাঁকিচরা, আসামের বাঁকিচরা থেকে রওনা দিয়েছে ওরা !

ও! বাঁকিচরা ? খুব দুর্বল ও স্বপ্নাতুরভাবে মাথা ঝাঁকায় 'সায়েরা, ও চেনে না। কিন্তু তোমরা একটা মানুষকে দেখেছ ? ওই সব গঞ্জে আর বন্দরে ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়তো! খুব লম্বা আর বদরাগী মানুষ। জোলাদের তৈরী লুঙ্গি হাঁটুর ওপর উঠে আসত তার। ঘরের চালে ঠেকে

যেত বলে একটু কুঁজো হয়ে হাঁটা অভ্যেস হয়ে গেছে তার ; দেখেছ সেই লোকটাকে ?

দেশে চাল মিলছিল না, তাই রাগ হয়েছিল খুব। রাগ করে গাঁ ছেড়ে চলে গেল আসামে। খিদের জ্বালায় কি না করে মানুষ। কিন্তু এখন হয়তো ফিরে আসতে চাইছে। যাদের ভালবাসে মানুষ, তাদের খুব অসুখ বিসুখ করলে বিদেশেও টের পায় অনেক দূরের লোক। তাই পেয়েছে হয়তো। গাঁয়ের দিকে কোন্ নৌকা যাবে তার তল্লাশ করে বেড়াচ্ছে। দেখেছ ?

নুন আসবে, কেরোসিন তেল আসবে, আর কিছু কাপড় ?

আর ওষুধ।

গাঁয়ের মানুষেরা নয়, স্টিমার ঘাটে গঞ্জের ব্যাপারীরা এসে ভীড় করে। ফকৃব্যা গুদামের তালা খুলে দেয়। স্টেশন মাস্টার তদারক করেন। ডাক্তারবাবুর লোককে বাক্‌স্‌টা নিজের হাতে তুলে দিল ফকৃর‍্যা। কুইনিন। এক পাউণ্ড আড়াইশ টাকা।

তারপর কাজ সেরে এন্তাজের দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াল। অস্বাভাবিক রকম নিষ্ঠুর হয়ে গেছে ওর গলার আওয়াজ—ওষুধ খায়্যা কাম নাই ; কব্‌রেজ মশার পাঁচনে যদি বালো অও বুঝ্‌ক খোদা বালো করছে !

খোদা ? জ্বরে ভুগে ভুগে এন্তাজের আগ্রহটা কি রকম করুণ শোনাল।

নমশূদ্র পাড়া থেকে ভেসে আসে মাঠ পার হয়ে। ওদের দেবতা রক্ষা করছে ওদের। নমশূদ্র।

পাড়ায় কটা লোক মরেছে তারপর থেকে ? কই মরেনিতো আর !

ফকৃয়্যা চলে গেলে সায়েরাকে চুপি চুপি ডেকে বললে এন্তাজ—কব্যার পারিস মৌলবী সায়েব হজ্ গিচ্ছিল, হে কয় বছর?
বছর পাঁচ ছয়।
কিছুক্ষণ ভাবল এন্তাজ। মনের ভেতর ভাবনাটা ঠিক মতো গুছিয়ে নিয়ে বললে—জম্‌জমের পানি হ্যার ঘরে থাকৃফ্যার পারে কিছুডা?
থাকৃফ্যার পারে, প্রতিধ্বনির মতো সায় দিল সায়েরা।
তীব্র আশায় উঠে বসল এন্তাজ, এক দুই ঢোঁক, তিন ঢোঁক হবে, এতটুকু জল নিয়ে আসুক না সায়েরা। ছেলেটাকে দিক, এন্তাজকেও দিক একটু।
কিছু বললে না সায়েরা। নদীর ঘাট থেকে ঘর সংসারের হাজার কাজে ফিরে এসেছে ও। চোখের ওপর স্থির কালো আতঙ্কের ছায়া আশার ঝিলিকে ছিঁড়ে যাবে না কখনো।

নৌকা আর কাঠের আড়তের পরে একটা বাঁক; লম্বা সরু একখানি চর তুলে যমুনার স্রোত সেখানে থেমে এসেছে, সবুজ হয়ে উঠতে চেয়েছে অবসাদে। সেইখানকার ময়লা জলের ঝাঁড়িতে একদিন আটকে গেল দুটো মড়া। গলাখসা ফুলো জিনিস দুটোর ওপর ঝেঁকে বসল একদল শকুন। দু দিন পর আরো একটা মড়া ভেসে এল।
মহামারী। যমুনার সোজা হাওয়ায় কান পেতে কান্না শুনতে পায় কেউ।
বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গাঁয়ের লোক মড়া তিনটেকে ঝাঁড়ি' থেকে বার করে যমুনার প্রধান স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়ে দিয়ে এল। আপদ! গাঁয়ের মাথার ওপর শকুন উড়বে, পচা মাংসের টুকরো নিয়ে মারামারি করবে, আপদ গেছে।

কিন্তু গাঁয়েব ঘাটে মড়কেব মড়া এসে লাগে ; গেবস্থ বাড়ীতে উড়ে পড়েছে শকুনেব পালক। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল মুসলমানদের। সেই ফকিব আকাশে তাব কালো ডাণ্ডাটা উঁচিয়েছিল। সেই ফকিবেব কাছে ওষুধ চেয়ে বাখেনি কেউ। মাতব্বর আব ধার্মিক মুসলমানবা এস্তাজেব বাড়ীতে এল। পুবনো লোক বলে সম্মান আছে এস্তাজেব।
জ্বরে কেঁপে কেঁপে এস্তাজ বললে, হিন্দুব দেবতা বক্ষা কবছে নমোদেব, বিধর্মীব দেবতা। কিন্তু সৎ আব ধার্মিক মুসলমানবা কি কবছে ? আল্লাব দোয়া চেয়ে নিতে হবে না তাদেব ? নিজেরা না জানে—নিজেদেব যতটুকু সাধ্য আছে—

আল্লা হো আকবব।
জনপঞ্চাশেক লোক আওয়াজ মিলাল, আল্লা হো আকবর !
হুয়্যাল্ হক্ !
হুয়্যাল্ হক্।
খোদা তুমি খেদিয়ে দাও ওদেব, প্রতিশোধকামী হিংস্র ভূত প্রেত দেবতা দানবকে। মড়কেব ডাইনীকে তাড়িয়ে দাও গাঁয়ের সীমানাব বাইবে। ওব বোখ একেবাবে যাবে না। তা হলে মাত্র একজনকে ছুঁয়ে চলে যাক ও। সমস্ত গায়েব লোক ঘবে ঘবে অসুখে কাতবাচ্ছে যে আল্লা।
আল্লা হো আকবব।
ইবলিশেব কাছ থেকে আসছে ওবা। আল্লা তোমাব ফেবেস্তাকে পাঠাও। নমশূদ পাড়াব তিনটে মানুষ খেয়েছে ওবা। বিধর্মীর দেবতা হয়তো বাঁচাবে ওদেব। কিন্তু মড়কেব ভূত দুজন মুসলমানকেও খেয়েছে আল্লা, দুজন ধার্মিক মুসলমান—বুড়ো কাদেব মিঞা আর নেওয়াজ

আলিকে। আর ঘরে ঘরে গো-সাপের মতো বিষাক্ত থুথু ছিটিয়ে এসেছে ওই দানোরা, ঘরে ঘরে বেহুঁশ হয়ে রয়েছে মানুষ—খাটতে পারছে না, রোজগার নেই। খোদাতালা, খেদিয়ে দাও ওদের—জাহান্নমের আগুনে পুড়ে যাক ওদের বদমাইসী।
টহল দিয়ে বেড়াল মুসলমান পাড়ার লোকজন থালায় করে জমির ভাল চাল, গাঁয়ের সব চেয়ে ভাল পাঁঠাটা, এ তল্লাটের সেরা মৌলবীকে নিয়ে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে চীৎকার করে করে ঘুরে গেল গাঁয়ের সীমানা। তারপর আর্ত প্রার্থনায় নামাজ পড়ল একজোট হয়ে।

এইস্থান্

আশ্বস্ত হাসিতে ভরে যায় অসুস্থ লোকদের মুখ। একটু শক্তি যাদের আছে তারাও ঘরের বাইরে গিয়ে বসে তামাক খেতে চায়। সুস্থ মানুষের মতো বাইরের খাটুনির জগতের খবরাখবর নেয়। সাংসারিক লোকের নানান ঝঞ্ঝাট, দায়িত্ব ও ব্যবস্থা বন্দোবস্ত নিয়ে চিন্তিত হতে ভাল বাসে। পথের লোককে ডেকে আলাপ করে—সেলাম আলেকুম, 'বাইসায়েব'কে তো এদিকে কোনদিন দেখেনি ও? এ অঞ্চলের লোক নয়; অপরিচিত মানুষটা জানায় এদিক দিয়ে হেঁটে সোজা ভাঙাবাড়ী, যাবে; সুতো কিনবে হাটে।
ভাইসায়েবের কটা তাঁত?
তাঁত একটাই। আরো একটা ছিল বটে, কিন্তু এখন বন্ধ। একটা তাঁতেরই সুতো পাওয়া যায় না।
তাতো বটেই; আচ্ছা ভাইসায়েবের গাঁয়ে অসুখ বিসুখ কি রকম? পথের লোক চলে যায়। লোভী চোখ দুটো সুযোগ খুঁজে বেড়ায়, দুটো গল্প করার, দুটো খবরাখবর দেয়া নেয়ার। চরের ঘাসে গরু নিয়ে যেতে

অসাবধানী ছেলেটা ধান গাছের ক্ষেতের মধ্যে গরু ছেড়ে দেয়। ঠাহর পেয়ে হাতে ডাণ্ডা দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে শাসন করে।
সুযোগ। অসুস্থ লোকটা হাঁ হাঁ করে, এই এই ছেলে, মারছে কেমন দেখ ?
গাছ খায় কেন ?
তারপর ছেলেটাও চলে যায়। সুস্থ মানুষের আবেগ ও অভ্যাস আস্বাদ করার জন্যে লুব্ধ হয়ে ওঠে মানুষ। যারা পারে, তারা নদীর পাড়ে নৌকা তৈরীর কাছে গিয়ে জোটে।
গৌর সা একটা পাঁচশমনী নৌকা বানাবে শুনেছ নাকি তোমরা ?
কই আমরা জানি না। যাবে নাকি ওর কাছে ?
উয়োহ্! গত আকালটায় লোকটা একসের চাল দিয়েছিল বাকিতে ?
না নিলাম বায়না।

আশ্বস্ত হয়েছে এস্তাজ। সায়েরার ছেলে ঘুমুচ্ছে। এস্তাজ হাত দিয়ে বুঝতে পারবে না হয়তো কিন্তু ওর এখন অনেক জ্বর। তা হোক। কাঁথার তলে ছেলেটাকে নিজের শাদা চুলে ভরা বুকের কাছে টেনে নেয়। অনেক দিন আগে বিজ্ঞাপন-আঁটা এক হাওয়াগাড়ী শাদা শাদা বড়ি বিক্রী করেছিল। খোদার দোয়া হলে ও সম্বন্ধে মানুষ ভাবে নাকি আর ?
কাহিনী শুনবি, সায়েরার ঘুমন্ত ছেলের কানে কানে বলে এস্তাজ, কাহিনী ?
খুব গরিব কানা খোঁড়া সেই ফকির খোদার নাম নিয়ে ভিক্ষে করত—
একদিন এক ধনী লোক এসে বললে, তোমার ভাল হয়ে যাবে, চোখে দেখতে পাবে, কিন্তু খোদার নাম ছেড়ে দাও—

ফকিরের মনে লোভ হল। ' আকাশের দিকে থুথু ফেললে—খোদা আমার পা সারিয়ে দেয়নি, চোখ ভাল করেনি। যে আমাকে ভাল করে দেবে তার নফর আমি।

তারপর তার পা ভাল হয়ে গেল, চোখে দেখতে পেল—কিন্তু সেই ধনী লোকটি তো শয়তান, খোদার শত্রু…

শয়তানের নফর হয়ে খোদার ক্রোধ এড়াতে পারবে কখনও?

সেরে যাবে তা হলে—খুঁটিতে ঠেস দিয়ে সায়েরার চোখে সহসা অবাধ্য স্বপ্ন নেমে আসে: লম্বা আর বদরাগী সেই লোকটা ফিরে এসেছে।

বদনা করে আজুর পানি এগিয়ে দিল সায়েরা, পিঁড়ি পেতে দিল বসতে: ছেলের কি অসুখটা গেল জানো? মহামারীতে কি অবস্থা হয়েছিল গাঁয়ের?

জানে, লম্বা রোগা মানুষটা আমাদের গঞ্জে আর বন্দরে ঘুরতে ঘুরতে টের পেয়েছিল তা…

মড়ক! মড়ক!

ভিনদেশী এক ফকির কালো সাপের মতো অশুভ লাঠিটা উঁচিয়েছিল আকাশের দিকে। কালো পাথার ঝাপটা মেরে আকাশের সেই কোণ থেকে দলে দলে উড়ে আসছে শকুন। যমুনার কাঁড়িতে আবার এসে আটকে গেছে কয়েকটা গলাথসা মানুষের মৃতদেহ।

নমশূদ্র পাড়ার দুজন চাষা মরে গেল আবার। মুসলমান পাড়ার চারজন। নদীর পাড়ে ঠুক্ ঠুক্ শব্দ থেমে গেল একেবারে—ভিনদেশী করাতীরা পালিয়ে গেল কোথাও।

কিন্তু আলতা-পা সিন্দুর-কপালী সেই মেয়েটি কি গঙ্গা নয়? সতীসাধ্বী

সব থেকে কে আছে এই অঞ্চলে, মনে মনে সব থেকে কে ভক্তিমতী অথচ টের পায়নি কেউ ?

কেন, নমোদের পাড়ার সেই বৌটিই তো।

পাচ মাইল দশ মাইল দূরের লোকজন সেই খবর শুনেছে। মরিয়া হয়ে ভেঙে আসছে মানুষ। ভাল হবে না কি ? মনে পাপ না রেখে পবিত্রভাবে ডুব দাও। ডুব দাও। যদি ভাল না হয় তাহলে যে আর কোন আশাই নেই গো—কোন আশাই নেই।

ভোর রাত্রের অন্ধকারে প্রেতিনীর মতো উদ্‌ভ্রান্ত ধাক্কা মারছে সায়েরা। ধীরে ধীরে এন্তাজের নিশ্চিন্ত আলিঙ্গন আলগা হয়ে এল ; জেগে উঠল এন্তাজ : ওর দুই হাতের নির্ভয়েব ভেতরেও সায়েরার ছেলে কি রকম হয়ে গেছে।

বাজান। সায়েরার চোখ থেকে সেই স্থির আতঙ্কের ভাবটা কেটে গিয়ে একটা অতলস্পর্শ দৈহিক যন্ত্রণা দপ্ দপ্ করছে। গলা চিরে কান্নার মতো একটানা শব্দ বেরিয়ে আসছে একটা। সায়েরার ছেলের বুকের ভেতর থেকে ফাটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে। মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছে শব্দ, আবাব বেরুচ্ছে। মরবার আগে ঐ রকম হয়।

সায়েরাকে সান্ত্বনা দেওরাব কথা মনে হল না এন্তাজের। মরা ছেলের জন্যে একবিন্দু শোক নয়। ভয় ! ঠাণ্ডা ধূসর এক স্পর্শ আস্তে আস্তে অবশ করে দিল ওর হাত।

বুকের ওপর মড়কের অন্তিম নখ বিঁধে যাওয়ার পরে পেছনকার ধূ ধূ অন্ধকারে সহসা দেখা গেল কোথাও কোন অভয় নেই।

যমুনার বাঁকে ঝাঁড়িতে আরো মড়া এসে জুটেছে, মানুষের আর গরুর। বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নদীর মাঝ স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্যে এবার এগিয়ে এল না কেউ। গাঁয়ের শেষে জোলাদের বাড়ী ঢুকে

আধ-মরা একটা লোককে কামড়ে কামড়ে খেয়েছে জঙ্গলের শেয়াল। ছুটো মরা ছেলে সামনে নিয়ে তিন দিন ধরে.একটানা কেঁদে যাচ্ছে নেওয়াজের বিধবা বৌ। গোর দেওয়ার লোক নেই কেউ।

সায়েরার ছেলেকে মাটি চাপা দিয়ে ফিরছে ফক্‌র্যা। লোক মেলেনি সমস্ত কাজ একাই করতে হয়েছে তাকে।

বর্ষার সঁ্যাতসেঁতে অন্ধকার থমথমিয়ে রয়েছে মাঠে মাঠে। নদীর স্রোতের অস্ফুট শব্দ। অর্ধেক তৈরী নৌকার কাঠামো, কাঠ চেরাইয়ের বাঁশের মাচা ধ্বস-খাওয়া পাড়ের পাশে অন্ধকারে সেই সব জন্তুর পাঁজরার হাড়ের মতো দেখায় পৃথিবীতে যারা একদিন বেচেছিল। অনেক দূরে একলা একটা নৌকায় কেরোসিন তেলের ডিবি ছুর্বল হিংসায় লাল হয়ে কালি ছড়ায়। এ পাশে ঝাঁড়ি থেকে শকুনেব পাখার শব্দ খস খস কবে ওঠে।

একটু আগে ছায়াব মতো কে হাঁটছে। গায়ের লোক হতে পারে বলে ফক্‌র্যা ভাঙা গলায় হাঁক দিল—কেডা যায় ?

লোকটা উত্তর দেয় না। ভেজা মাঠেব মধ্যে দিয়ে ছুবলভাবে পা ঘষে ঘষে চলতেই থাকে।

পা চালিয়ে লোকটাকে ধরে ফেলল ফক্‌র্যা, আশ্চর্য হয়ে বললে— তুমি ? কনে গিছিল্যা ?

ঠক্ ঠক্ করে শীতে কাঁপছে লোকটা। ঘাড়টা নীচু হয়ে থুতনিটা ঠেকে গেছে বুকের সঙ্গে। ছুই হাত আড়াআড়িভাবে নিজের শরীরটা চেপে ধরেছে। গায়ে হাত দিয়ে চমকে গেল ফক্‌ব্যা—ভেজা গা, সপ্ সপ করছে কাপড়।

কনে গিছিল্যা ?

কথা বলবার আপ্রাণ চেষ্টায় মুখ তুলল লোকটা। কাঁপুনি এসেছে,

সমস্ত শরীরকে গুঁড়ো করে ফেলার মতো কাঁপুনি। গলার স্বরটা বিকৃত তীক্ষ্ণ হয়ে অন্ধকারে ছিঁড়ে যাচ্ছে।

চান করা আলাম ওই ডোবাডায়, ওই ডোবাডায়; নমোদের অসুখ তো বালো অয় শুনি, আমার হোবে না ক্যান্?

জাহান্নমের কালো আগুন থেকে আর্ত প্রশ্ন করলে এস্তাজ।

খুনীর ছেলে রহিম। ওর বাপ ছিল ফিরিওয়ালা। মফস্বল শহরে রাস্তায় রাস্তায় সওদা হেঁকে বেড়াত, ছুরি, কাঁচি, রবারের পুতুল, চুল বাঁধার ফিতে, পুঁতি, টিপ—জার্মান, জার্মান মাল সব। ইস্কুলের ছেলেরা কিনত দু-ফলা তিন-ফলার ছুরি, পেতলের খাপে এক মুখে পেন্‌সিল, আর এক মুখে কলম। দুপুরে বৌ-ঝিরা ঘুম নষ্ট করে খুকীদের জন্যে কিনত ঠুনকো পুতুল, আর নিজেদের জন্যে চুল বাঁধার ফিতে। মেপে দেওয়ার সময় একটু শয়তানী করবে লোকটা, হাত-আন্দাজ মাপটা কেমন করে খাটো করে ফেলত। টের পেলে অবিশ্যি রক্ষা রাখে না মেয়েরা। কিন্তু ফিতে কাটা হয়ে গেছে—কাটা ফিতে ফেরত নেওয়ার মতো বান্দাও ও নয়। শেষকালে রফা হত একটা, ও কিছু ছেড়ে দিচ্ছে, আপনারাও কিছু ছেড়ে দিন, এই রকম।

দেখে মনে হত যে দু-চার পয়সা কামাচ্ছে লোকটা। ফিরিওয়ালাদের চেহারা সাধারণত যে রকম রোগা হয়ে থাকে ওর তা নয়। কড়া যোয়ান চেহারা। রোদে পোড়া মুখটা থ্যাব্‌ড়া কিন্তু নিষ্ঠুর নয়। ছোট করে

ছাঁটা মোছের দু ধারটা একটু লম্বা, মেহেদির পাতায় রাঙানো। চৌকো ছাঁটের ফতুয়ার হাতার বাইরে কনুই থেকে হাত দুটো চ্যাটালো পেশীর পাক খাওয়া। পরিশ্রম করে দু বেলা পেট পুরে খেতে না পেলে ও রকম গতর হয় কারো? তবু, মানুষের কি দুর্মতি, তলে তলে যে নিজের সর্বনাশ সেধে রেখেছিল, কেউ জানত না। কালীচরণ সরকারের কাছে বেচারী এককুড়ি টাকা ধার নিয়েছিল বৌয়েব সোনাবাঁধা বালা বন্ধক রেখে। একদিন গেল ছাড়িয়ে আনতে। রেজগি আর টাকায় মিশিয়ে এককুড়ি টাকা গুনে দিয়ে জোড় হাত করে বসে রইল তক্তপোশেব সামনে। কালীচরণ নীরবে টাকা কটা তুলে রাখল সিঁদুরমাখা ক্যাশবাক্সটায়, তারপর তুলোট কাগজের খাতাটা বার করে কি সব লিখলে। লেখা হয়ে গেলে তুড়ি দিয়ে আয়েস করে যা বললে তা বয়স হওয়া সত্ত্বেও বুঝতে পারেনি লোকটা।

কুড়ি টাকা ধার নিয়েছিলে বাপু, টাকায় আট আনা সুদ, তিন বছর হয়ে এল, সুদই তোমার গিয়ে পড়বে সাড়ে বাইশ টাকা। কুড়ি টাকা উশুল নিলাম, তাহলে গিয়ে এবছরের দরুণ সুদের রইল আড়াই টাকা, আর ওদিকে তো দু-কুড়ি পাচ টাকা আসল, বুঝলে?

অনেকখন কালীচরণের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়েছিল লোকটা, বুঝতে পারেনি। যখন পারল সামনের ক্যাশবাক্সটা দুই হাতে তুলে নিয়ে ঝাঁ করে বসিয়ে দিল কালীচরণের মাথায়। থেঁতো খুলি থেকে ঘিলু আর রক্ত ছিটকিয়ে ছড়িয়ে নোংরা করে দিল তক্তপোশ টা।

ইস্কুলের দুষ্টু ছেলে আর কঞ্জুস বৌ-ঝিদের সঙ্গে হাজারটা দেনা পাওনার যাকে কোনদিন চটে উঠতে দেখা যায়নি, সেই লোকটা কোম্পানীর খুঁতখুঁতে আইনে দ্বীপ চালান হয়ে গেল।

সেই বাপের ছেলে রহিম। বড়ো হয়ে উঠে চুলবাধার ফিতে ফিরি

করার ইচ্ছে হল না ওর ; দেলুয়ার ছ্যাকৃরা গাড়ীর আড়তে গিয়ে জুটল। প্রথমে ঘোড়ার খবরদারি করা শিখল ও, প্যাসেঞ্জারদের জন্যে গাড়ীর দরজা খুলে দেওয়া, ছাতের ওপর মালপত্তরগুলো গুছিয়ে রাখা। তারপর একদিন দেলুয়া তার পুরনো ঝরঝরে একটা গাড়ীকে সারিয়ে নতুন করে তুলল, চাকার অকেজো স্প্রিং দুটোকে বদলিয়ে, আর হাল ফ্যাসানের রবারের টায়ার লাগিয়ে। চকচকে রঙ করে, নকসা এঁকে, সিটের চামড়া পাল্‌টে গাড়ীর ভিতর লিখে দিলে—"মালিক শ্রীদেলুয়া তেওয়ারী"। টাটকা রঙ-চামড়ার গন্ধে রহিমের মনটা টিপ টিপ করে উঠল ; ঝানু গাড়োয়ান বুড়ো মিঞাকে গিয়ে ধরলে—কেনে, গাড়ী আমি চালাইতে লারব, না কি বলছ তুমি ?

বুড়ো স্বীকার করল, তা বটে অনেকদিন চুরি করে করে অন্য গাড়োয়ানের গাড়ী চালিয়েছে ও।

তা অলে দেলুয়াকে বলে দাও কেনে, বাড়ীটা আমি চালাই ?

তা বটে, বুড়ো মিঞা মাথা ঝাঁকাল, সেয়ানা হয়ে উঠেছে ছোঁড়াটা। যোয়ান মানুষের মত রোজগার এখন না হলে চলবে কেন।

দেলুয়া আপত্তি করে নি। তাই কুড়ি বছরের রহিম কাঁচা রোদ লাগা চোখে কোচম্যানের বাকৃসে উঠে খুশি হয়ে উঠবে না তো কি ? তাছাড়া সত্যি কথা বলতে গেলে খুশির কারণ যে চকচকে গাড়ীটা তা নয়। কেন, ওই তো রফিক যে গাড়ীটা চালায় সেটাও তো কম সুন্দর নয়। তবে ? কারণ আছে বই কি, আসুক দেখি রফিক গাড়ী ছুটিয়ে পাল্লা দিক ওর সঙ্গে—

কারণ হচ্ছে একটা ঘোড়া। টগবগে তাজা চেহারা, রহিমের মতো যোয়ান। আশেপাশের গাড়ীটানা মরখুটে ঘোড়াগুলোর মধ্যে ওটা চোখে পড়বেই। আস্তাবলে কাজ করার সময় এই ঘোড়াটাকে ও

চিরকালই একটু বেশী যত্ন করে এসেছে। নতুন গাড়ীটার ভার নেওয়ার সময় তেওয়ারীর কাছ থেকে চেয়ে নিল ঘোড়াকে।—এই ঘোড়াটাকে লোতুন গাড়ীতে যুতে দিলাম তেওয়ারীজি।

জোড় মিলবে না যে রে, টানতে পারবে না—গুলিখোর বুড়ো মিঞা চটে গিয়ে গালাগালি দেয়।

না মিলুক।

ঘোড়াটা নিয়ে রহিম সত্যিই পাগল। পক্ষিরাজ, আদর করে ডাকে ও। নীল মোটা মোটা পুঁতির মালা দিয়ে সাজিয়েছে ওকে, মাথার ওপর উঁচিয়ে দিয়েছে পালকের সাজ। বাদামী রঙের জানোয়ারটার কপালে আছে শাদা লবঙ্গফুলের মতো একটা চিহ্ন। সেইখানে মেহেদি পাতা ঘষে দেয় মাঝে মাঝে। এখন সখ গিয়েছে দুই কানে দুটো পিতলের মাকড়ি পরিয়ে দেবে।

তু উকে সাদী করে লে রহিম, ঠাট্টা করে রফিক। সত্যি করে ভালবাসতে পারলে যেমন হয়, রহিমের মুখটা খুশিতে মিষ্টি হয়ে আসে; বলে, দাঁড়া মাকড়িটো পরিয়ে দেই, তারপর দেখিস শালা—

পক্ষিরাজের পিঠ বাঁচিয়ে বাঁ দিকের জুড়ি ঘোড়াটার ওপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাবুকের বাড়ি মারে। কায়দা করে লাগামটা ধরে হাঁক দেয়—এই যে—যাবে, যাবে স্টেশন?

রফিক প্যাসেঞ্জার খুঁজে বেড়ায়। খাটো মাপের রাস্তাটা একবার ঘুরে এসে চৌমাথায় রহিমের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় খোঁচা মেরে যায়—তুর এক চোখ কানা বটে রহিম। উঁ ঘোড়াটাকে মেরে মেরে পিঠের খাল খিঁচে দিলি যে—

শালা, উ-কি ঘোড়া আছে নাকি? পক্ষিরাজের পিঠ বাঁচিয়ে মরখুটে জানোয়ারটাকে আবার চাবুক মারে ও—কৃচ্যা—কৃচ্যা—কৃচ্যা স্টেশন, যাবে স্টেশন?

স্টেশন থেকে ফেরার সময় প্যাসেঞ্জার কেড়ে নেওয়ার হিড়িক; দেলুয়ার দৈনিক জমা পাঁচ সিকে পয়সা না মিটিয়ে উপায় নেই।

আসুন মাশায়, এই যে বাবু, এই গাড়ীতে—রবারের চাকা দেখে উঠবেন—

ওই বাবু, আপনাকে রোজই লিয়ে যাই যে আমি ?

ঘোড়া দেখে উঠবেন বাবু, পক্ষিরাজ ঘোড়া—

তিনটে সিট হয়ে গেছে বাবু, আর একটা শেয়ার।

এই যে বাবু শেয়ারে যাবেন নাকি ?

ছাড়ল ! ছাড়ল ! খালি গাড়ী আছে মাশায়।

রমজানের সঙ্গে ঝগড়া হয়, গোলাম আলির সঙ্গে; গুলিখোর বুড়ো মিঞার সঙ্গে কুৎসিত গালাগালির পাল্লা চলে। তারপর ব্যস্ত ভঙ্গী দেখিয়ে লাগামটা টেনে নিতে নিতে ঝগড়াব কথা একদম ভুলে যায় ও। কথামতো গাড়ী ছাড়তে একটু দেরী করে। ভেতর থেকে প্যাসেঞ্জাররা তাগিদ দেয়,—কই হে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? রহিম তবু দাঁড়িয়ে থাকে; লাগাম টানার কায়দায় গাড়ীটা চলবে এই রকম ভাব দেখিয়েও তবু চলে না। রফিকের প্যাসেঞ্জার তিনটের সঙ্গে হয়রানি দর কষাকষি শেষ হলে লড়াইয়ে ডাকে—কি রে, ছুটবি ? রফিক দৌড়ে নামবার আগে খতিয়ে নেয় ব্যাপারটা—তুর কটা সওয়ারী ?

পাচটো সোয়ারী, আর এই দেখ মাল—লে আয়—

জেতবার সম্ভাবনা রফিকের ষোল আনা; কেন না ওর মাত্র তিনটে সওয়ারী, শহরে এসেছে মামলা করতে। মালপত্তরও কিছু নেই। তাই বাজী ধরল—লে হাঁকা—

কৃচ্যা—কৃচ্যা—কৃচ্যা—হে-হে-হে-হা-হা-হা—

ছুটল দুই গাড়ী। আশেপাশের স্টেশন-ফিরতি গাড়ীগুলোকে

পেছনে ফেলে। গাড়ীর ভেতর সাবধানী আরোহীদের মৃদু আপত্তি লোহাকাঠের হাজার শব্দে নিভে গেল। দুই মাইল পথটা দু মিনিটে পাড়ি দেওয়ার অসম্ভব ঝোঁক চেপেছে রহিমের—রফিকের হালকা তরতরে গাড়ীটাকে কিছুতেই বাগ মানানো যাচ্ছে না। তাজা পক্ষিরাজের সঙ্গে সমান পাল্লায় জোড় মিলাতে পারছে না পাশের জানোয়ারটা। যা কথনো করে নি, রহিম পক্ষিরাজের পিঠের ওপর অসহিষ্ণু বাড়ি মারলে। হুমড়ি দিয়ে পড়ল বা দিকের বদখত জানোয়ারটা, সামনের দুই পা ভেঙে গাড়ীটাকে কাত করে। একটু আগে রফিকের গাড়ীটাও দাঁড়িয়ে পড়ল মজা দেখতে।

সমস্ত কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল রহিমের, পিঠের ওপর ভয়ার্ত প্যাসেঞ্জারদের তিরস্কার আছড়ে পড়ছিল আগুনের হল্‌কার মতো। হাঁটু-ভাঙা ঘোড়াটাকে ঠেলেঠুলে খাড়া করতে গেল রহিম। পা ভাঙে নি ওর। খাটবার, রহিমের ইচ্ছার সায় দিয়ে দৌড়াবার মন না থাকলে অমনিভাবে পা গুটিয়ে বসে পড়ার শয়তানী ফন্দিটা আয়ত্ত করে ফেলেছে শালা!

কি রে—ছোটাবি আর?

কুৎসিত আক্রমণের মত শোনাল রফিকের কথাটা। তাই মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াল রহিম, ছুটে গিয়ে গাড়ীটার চাকার ওপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের চাবুকটা দিয়ে কষে বাড়ি মারল একটা। খট করে একটা শব্দ হয়ে এক আঙুল ফাঁক হয়ে গেল রফিকের খুলি।

খুনী; খুনীর ছেলে রহিম। সহিস আর গাড়োয়ানরা সেদিন বুঝতে পেরেছিল তা। জাত খুনী ও। কালো ঝাঁঝাল রক্ত বইছে ওর শিরায়। কুড়ি বছরের যোয়ান বুকের অনেক অনেক তলে দুরূহ, স্তব্ধ একটা বাঁকা ভঙ্গী, নিজের ওপর কোন আক্রমণই যে সহ্য করবে না। দুশমনের রক্তের স্বাদে মরা বাচ্চার বাঘিনী-মায়ের মতো সে হিংস্র।

রহিমও জানে তা। এমন এক একটা সময় আসে যখন শরীরের সমস্ত হাড-গোড় থেকে নিঃশব্দ দ্রুত একটা ঢেউ অস্পষ্ট গর্জন করে বুকের ফাটলে ফাটলে এসে জমে। বাঁধের পেছনে অন্ধকার বন্যার মতো ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠতে থাকে,—নাক, কান, চোখ, কপালের রগ অতিক্রম করে তালুর নীচে গিয়ে ঠেকে। ক্রুদ্ধ, দুবন্ত সেই স্রোত কানা শুয়োরের মতো যে কোন একটা পথ খুঁজে বেড়ায়। মানুষকে তখন ও সহজেই খুন করতে পারে।

তবু এ পর্যন্ত কাউকে খুন করেনি ও। রফিককেও না: ভাঙা খুলি তো ওর পনের দিনেই জোড়া লাগল। পক্ষিরাজের ঘাড়ে হাত বুলিয়ে রহিম কসম খায়—না খুন আমি কাউকে করব না; কিন্তুক তুর সাথে কেউ দুশমনী করবে তো তাথে দেখে লিব আমি!

স্টেশন থেকে শহর, শহর থেকে স্টেশন—পাচটা ট্রেন ধরতে পাঁচ ক্ষেপ। ঘোড়াগুলোকে খেতে দেয়। নিজেরা সিগারেটের টিনের কৌটোয় স্টেশনের দোকান থেকে ঘোলা রঙের চা নিয়ে আসে। ঝগড়া করে, ঔর থোড়া দাও বাবু, এক কাপ হয়ে গেল? চায়ের ভেণ্ডার সেয়ানা লোক, ওদের কথা মোটেই শোনে না। ওরাও জানে শুনবে না, তাই কিছুক্ষণ পরে অন্য অনুরোধ করে—তেবে দাও খানিক গরম পানি ঢেলে দাও। সিগারেটের কৌটো এতক্ষণে ভরে ওঠে, ঘোলা রঙটা ফিকে হয়ে যায়, আস্বাদটা আরও পান্‌সে। তা হোক। খিদেটা কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত মরা মনে হবে। গোল হয়ে বসে জটলা পাকায়, শালা জিনিসপত্তরের দাম বেড়ে গেছে···

বুড়ো মিঞা সংসারের জন্যে চাল না কিনে সেই পয়সা দিয়ে দুধ কিনে খেয়ে ফেলে মাঝে মাঝে। গুলিখোর মানুষটার ভীষণ ঝোঁক দুধের ওপর। সেদিন অবিশ্যি বাড়ীতে তুমুল ঝগড়া হয়, ছেলে আর বৌ-এর

পেছনে ফেলে। গাড়ীর ভেতর সাবধানী আরোহীদের মৃদু আপত্তি লোহাকাঠের হাজার শব্দে নিভে গেল। দুই মাইল পথটা দু মিনিটে পাড়ি দেওয়ার অসম্ভব ঝোঁক চেপেছে রহিমের—রফিকের হালকা তরতরে গাড়ীটাকে কিছুতেই বাগ মানানো যাচ্ছে না। তাজা পক্ষিরাজের সঙ্গে সমান পাল্লায় জোড় মিলাতে পারছে না পাশের জানোয়ারটা। যা কখনো করে নি, রহিম পক্ষিরাজের পিঠের ওপর অসহিষ্ণু বাড়ি মারলে। হুমড়ি দিয়ে পড়ল বা দিকের বদখত জানোয়াবটা, সামনের দুই পা ভেঙে গাড়ীটাকে কাত কবে। একটু আগে রফিকের গাড়ীটাও দাঁড়িয়ে পড়ল মজা দেখতে।

সমস্ত কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল রহিমের, পিঠের ওপর ভয়ার্ত প্যাসেঞ্জারদের তিরস্কার আছড়ে পড়ছিল আগুনের হল্‌কার মতো। হাঁটু-ভাঙা ঘোড়াটাকে ঠেলেঠুলে খাড়া করতে গেল রহিম। পা ভাঙে নি ওর। খাটবার, রহিমের ইচ্ছায় সায় দিয়ে দৌড়াবার মন না থাকলে অমনিভাবে পা গুটিয়ে বসে পড়ার শয়তানী ফন্দিটা আয়ত্ত করে ফেলেছে শালা!

কি বে—ছোটাবি আর?

কুৎসিত আক্রমণের মত শোনাল রফিকের কথাটা। তাই মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াল রহিম, ছুটে গিয়ে গাড়ীটার চাকার ওপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের চাবুকটা দিয়ে কষে বাড়ি মারল একটা। খট করে একটা শব্দ হয়ে এক আঙুল ফাঁক হয়ে গেল রফিকের খুলি।

খুনী; খুনীর ছেলে রহিম। সহিস আর গাড়োয়ানরা সেদিন বুঝতে পেরেছিল তা। জাত খুনী ও। কালো ঝাঁঝাল রক্ত বইছে ওর শিরায়। কুড়ি বছরের যোয়ান বুকের অনেক অনেক তলে দুরূহ, স্তব্ধ একটা বাঁকা ভঙ্গী, নিজের ওপর কোন আক্রমণই যে সহ্য করবে না। দুশমনের রক্তের স্বাদে মরা বাচ্চার বাঘিনী-মায়ের মতো সে হিংস্র।

রহিমও জানে তা। এমন এক একটা সময় আসে যখন শরীরের সমস্ত হাড়-গোড় থেকে নিঃশব্দ দ্রুত একটা ঢেউ অস্পষ্ট গর্জন করে বুকের ফাটলে ফাটলে এসে জমে। বাঁধের পেছনে অন্ধকার বন্যার মতো ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠতে থাকে,—নাক, কান, চোখ, কপালের রগ অতিক্রম করে তালুর নীচে গিয়ে ঠেকে। ক্রুদ্ধ, দুরন্ত সেই স্রোত কানা শুয়োরের মতো যে কোন একটা পথ খুঁজে বেড়ায়। মানুষকে তখন ও সহজেই খুন করতে পারে।

তবু এ পর্যন্ত কাউকে খুন করেনি ও। রফিককেও না: ভাঙা খুলি তো ওর পনের দিনেই জোড়া লাগল। পক্ষিরাজের ঘাড়ে হাত বুলিয়ে রহিম কসম খায়—না খুন আমি কাউকে করব না; কিন্তুক তুর সাথে কেউ দুশমনী করবে তো তাখে দেখে লিব আমি!

স্টেশন থেকে শহর, শহর থেকে স্টেশন—পাঁচটা ট্রেন ধরতে পাঁচ ক্ষেপ। ঘোড়াগুলোকে খেতে দেয়। নিজেরা সিগারেটের টিনের কৌটোয় স্টেশনের দোকান থেকে ঘোলা রঙের চা নিয়ে আসে। ঝগড়া করে, ঔর থোড়া দাও বাবু, এক কাপ হয়ে গেল? চায়ের ভেণ্ডার সেয়ানা লোক, ওদের কথা মোটেই শোনে না। ওরাও জানে শুনবে না, তাই কিছুক্ষণ পরে অন্য অনুরোধ করে—তেবে দাও খানিক গরম পানি ঢেলে দাও। সিগারেটের কৌটো এতক্ষণে ভরে ওঠে, ঘোলা রঙটা ফিকে হয়ে যায়, আস্বাদটা আরও পান্‌সে। তা হোক। খিদেটা কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত মরা মনে হবে। গোল হয়ে বসে জটলা পাকায়, শালা জিনিসপত্তরের দাম বেড়ে গেছে···

বুড়ো মিঞা সংসারের জন্যে চাল না কিনে সেই পয়সা দিয়ে দুধ কিনে খেয়ে ফেলে মাঝে মাঝে। গুলিখোর মানুষটার ভীষণ ঝোঁক দুধের ওপর। সেদিন অবিশ্যি বাড়ীতে তুমুল ঝগড়া হয়, ছেলে আর বৌ-এর

হাতে মার খেয়ে পালিয়ে আসতে হয়, কিন্তু মনটা খুশি থাকে। বুড়ো মিঞা বসে স্বপ্ন দেখে পুরনো দিনের। বলে, কোথায়, এতগুলো গাড়ী ছিল নাকি তখন? উকিলবাবুরা গাড়ী চেপে কাছারীতে যেতেন। বুড়ো মিঞার মাসিক বরাদ্দ ছিল পনের টাকা আর তা ছাড়া ভদ্দর লোকদের ঘরের বৌ-ঝিরা তো এমনি আজকালকার মতো সড়ক দিয়ে হেঁটে যাওয়া আসা করত না। ইজ্জৎ সরম এসব ছিল। এ বাড়ী থেকে ও বাড়ী যাওয়ার সময় তাই গাড়ী ভাড়া করত। স্টেশনের ছুটকো শেয়ারের জন্যে কেউ মাথা ঘামাত নাকি তখন? আজকাল বড়োলোকেরা হাওয়াগাড়ী চাপে; ভদ্রলোকেরা পারত পক্ষে গাড়ীতে ওঠে না। তারপর ঐ—শালা কয়েকখানা টেক্‌সি আসতে শুরু করেছিল, স্টেশনে দু পয়সা করে শেয়ার নিয়ে গেছে ওরা। ভাগ্যিস এখন আর পেট্রল মিলছে না, তাই—

কিন্তুক জিনিসপত্তরের দাম বেড়ে গেছে যে ইদিকে, চালের দাম?

হুঁ, তা তো বটেই। বর্তমানে ফিরে আসা কি অসম্ভব বুড়ো মিঞার পক্ষে। রহিমের পক্ষে কিন্তু নয়। ওর কি? বাড়ীতে শুধু আছে একটা পেট, ওর চাচা। তা ছাড়া বুড়ো মিঞার তো ওগুলো গল্প—গল্প শুনে মন যতোখানি খারাপ হয় তার বেশী নয়। কিন্তু জিনিসপত্তরের দাম বাড়ছে বাপু এ ঠিক কথা।

দুপুরে সাড়ে এগারোটায় গাড়ী ধরে তারপর তিনটে অবধি বিশ্রাম। পক্ষিরাজকে খুলে চান করাতে নিয়ে যায় রহিম। কয়েক পা যাওয়ার পর কি মনে করে শয়তান ঘোড়াটাকেও খুলে নিয়ে যায়,—লে শালা তুখেও গোসল করিয়ে দিব আজ!

মজা পুকুর। অনেকদিন আগে সুদৃশ্য বাধান সিঁড়ি ছিল, হয়ত বুড়ো মিঞা দেখেছে তা, এখন ভাঙা। অসমান ইঁট আর মাটির স্তূপ;

এক কোণে বাউড়ীদের দুটো মেয়ে বাবুদের বাড়ীর এঁটো বাসন মাজছে। রহিম ঘোড়া দুটোকে নিয়ে হুড়মুড় করে সবুজ রঙের জলের ভেতর আছড়ে পড়ল। বাউড়ীদের মেয়ে দুটো ভান-করা আতঙ্কে শিউরে ওঠে :

মা-গো-মা, আমাদের মারবে নাকি গো—ওই মিনসে ঘোড়ার কানে মাকৃড়ি পরিয়েছে লো, হেঁসে মরে যাই—রহিম খুশি হয়ে ওঠে, মেয়ে দুটিকে এত ভাল মনে হচ্ছে। ওদের ঠাট্টার সুরে পক্ষিরাজকে আঘাত করার নোংরামি নেই। খুশি হয়ে পানাপচা ডোবাটায় হুস হুস করে ডুব দেয় কয়েকটা—তুদের চাইতে ভাল মাকৃড়িরে বেটি।

ঝামা ইঁট নিয়ে ঘোড়ার পিঠে ঘষে রহিম। নাকের ভেতর জল ঢুকে ঘোঁস্ ঘোঁস্ শব্দ করে ঘোড়া। বুকজল পুকুরটার পানা-পাকের ভেতর ক্ষুর ছুঁড়ে সাঁতার দিতে চায়। বাঁ হাতে ঘাড়টা ঠেলে ধরে ডান হাতে পিঠের ওপর থাবা থাবা চাপড় মারে শব্দ করে। আরামে পক্ষিরাজের পিঠের চামড়া কেঁপে কেঁপে ওঠে।

একচোখো রহিম। পক্ষিরাজের শুশ্রূষাতেই সময় ও সামর্থ্য ফুরিয়ে যায়। নিজের পেটের ভেতর রাক্ষুসে খিদেটা চন্ চন্ করে ওঠে। তাই বদ্খত জুড়ি ঘোড়াটার গোসল কোন রকমে শেষ করে উঠে পড়ে।

জলে ভিজে পক্ষিরাজের লম্বা কেশর আর লেজ কি রকম চুপসিয়ে থাকে, ভেজা ভেজা চোখে কেমন যেন দুর্বলতা। হঠাৎ বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে রহিমের, রোগা হয়ে যাচ্ছে নাকি পক্ষিরাজ ?

শালা চামার—আপন মনে গাল দিতে দিতে বাড়ী ফেরে রহিম, ঐ বেটা দেলুয়া, ঘোড়াকে খাওয়াবি না, পয়সা খরচ করবি না, অমনি অমনি গাড়ী টানবে তুর ? শালা গিরগিটির পারা মাথা ঝাঁকিয়ে বলবে, দাম বেড়েছে। বলে, আগে দু পয়সা দিলে দুই-বোঝা দল দিয়ে যেত সেথে,

আজ দু আনা পয়সা চায় ; কেনে ? তাই বলে খরচ করবি না তুই, না খাইয়ে রাখবি ?

জিনিসপত্তরের দাম বেড়েছে। দেশে লড়াই বাধলে নাকি দাম চড়ে যাবেই। চালাক ব্যবসায়ীরা টের পেয়ে মাল ধরে রাখে—আজ ফকির কাল রাজা। ব্যবসার নিয়মই এই।

রহিমের মনটা বিদ্‌ঘুটে রকম খিঁচড়ে যায়। চন্‌চনে খিদেটা ঠাণ্ডা করে নেওয়ার মতো যথেষ্ট ভাত হয়ত বাড়ীতে থাকবে না। বুড়ো অকেজো মানুষটা ওরই চাচা, তাড়িয়ে তো দিতে পারে না—অথচ খাটবে না, রোজগার করবে না। রহিমের পয়সায় টাকায় দু সের চাল কিনে এনে তিন দিন চালাতে পারে না, খিদেব ঝোঁকে বেশী খেয়ে ফেলে, রহিমের ভাগে কম পড়ে যায়।

শালা, খালভরা, দেলুয়া আর চাচাকে গাল দিতে দিতে বাড়ী ফেরে রহিম। টাকায় দু সের চাল কমে গেল আবো : দেড় সের, সোয়া সের, টাকা সের। কেউ বললে লড়াই, কেউ বললে আকাল। তবে দু-তিন দিনের ভেতরই দাম কমে যাবে, সবাই বললে। না কমলে চলে ? কত লোক মারা যাবে গো ? তাই কমে যাবে।

তবু কমল না। বুড়ো মিঞা মাথা ঝাঁকাল, এর আগে একটা লড়াই ও দেখেছে, কিন্তু এবার—শালা !

পাড়ার টিকেউলী মাগীটাকে জিজ্ঞেস করলে রহিম—কত করে টিকে বিচছো গো ?

আনায় ছটা।

হুঁ, দরটা বাড়িয়ে দিলে লাগছে ? রহিম বোঝবার চেষ্টা করল।

টিকেউলী মাগীটা নোংবা কালো হাত তুলে মারতে এল—টাকায় ক-সের চাল রে হতভাগা ?

রাস্তায় রাস্তায় গোবর কুড়িয়ে ঝগড়া করে বেড়াতো রমজানের মা। গরজ করে তার ঘরে গিয়ে উঠল রহিম—কি গো চাচী ?

চাচীর উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। লছমী মারোয়াড়ীর বজরার খিচুড়ি খেয়ে হেগে মুতে, সারাটা মেঝে থেকে বেড়ালের মতো আঁচড়ে আঁচড়ে মাটি ছড়িয়ে এখন ঠাণ্ডা হয়ে আছে। ঘুঁটের দর বাড়িয়েছে কিনা জেনে নেওয়া হল না।

তা হোক, কি করতে হবে রহিম আন্দাজ করেছে। স্টেশনে সবাই জুটলে রহিম বললে—আর লয়কো, ভাড়া বাড়িয়ে দাও গাড়ীর। এক গাড়ী ছ-আনা চলবে না আর, আট আনা ; না খেয়ে মরব নাকি সবাই, বলো ?

ভাড়া বাড়াইলে যদি না রাজি হয় প্যাসেঞ্জাররা ?

না বললেই হল নাকি ? ওই ? চালের দর কতো ? বলব, এক কথা, আট আনা গাড়ী বাপু, হয় তো উঠুন—

এ্যাই, হয় তো উঠুন !

রাজি হয়ে গেল সবাই। গুলিখোর বুড়ো মিঞা সব চেয়ে বেশী চীৎকার করলে, গালাগালি দিলে। গুলি খেয়ে খেয়ে শরীরের শিরাগুলো টান টান হয়ে এসেছে ওর, জল রোদ্দুরে পাকানো পুরনো নাগরা জুতোর মতো বেঁকে কুঁকড়িয়ে এসেছে শরীরটা। খালে ঢোকা পেটের তল থেকে কিট্‌কিটে কথাগুলো টেনে টেনে ছুঁড়ে মারল ও—শালা খেতে লাগবে না আমাদের ? কেনে আট আনা ভাড়া দিবে না উয়োরা ? টাকা নাই উয়োদের পকেটে ? ফোতো বাবু হয়ে গেইছে সব ? তা বলুক, ভাড়া দিব না, তা হলে দেখে লিছি আমরা—

এ্যাই, দেখে লিছি আমরা।

রহিমের মনটা খুশি ছিল। একটু দূরে একটা বুড়ো বসে বসে ধুঁকছিল। মানুষ নয়, হাড়। শুকনো আমগাছের মতো অসমান, উঁচু নীচু , ভাঙাচোরা

স্তাড়া খুলির ওপর কয়েকটা শাদা রোঁয়া কোনরকমে থেকে গেছে এখনও। অন্যান্য মাগী ও ছেলেরা স্টেশনের গেটে, প্ল্যাটফর্মে, প্যাসেঞ্জারের পেছু পেছু ছড়িয়ে পড়েছে। বুড়োটা একা। রহিম তার কৌটো থেকে চা ঢেলে দিতে চাইল—লে হাঁ কর।

কী ?

চা লে, হাঁ কর,—শালা খিদে তেষ্টা বহুত কমে যাবে। বুড়োটা হাঁ করল না। নিশ্বাসের মতো শব্দে বহু কষ্টে বললে—খানিক ভাত দাও কেনে।

ওই শালা বুড়ো ভাতেব লেগে লেলাইছে দেখ, বুড়ো মিঞা পুনরায় চটে উঠল ; তেড়ে মারতে এল ও। রহিম আটকাল, মনটা খুশি ছিল রহিমের।

ভাড়া বাড়ল বটে, কিন্তু বাড়তি ভাড়াটুকু পাওয়া গেল না। ঠিক দু দিন পবেই দেলুয়া এসে বললে, মুদীরা বলছে চোদ্দ ছটাক চাল নিতে হবে—

হ্যাঁ তা তো বটেই বাপু, বলছে তো মুদীরা।

হরেক জিনিসের দাম আগুন, ছোঁয়া যাচ্ছে না—পুড়ে যাচ্ছে হাত।

কি হাল হল দেশের, গরিব লোকেরা বিলকুল মরে যাবে। ভদ্দর লোকেরা চাকরি বাকরি করছে, সরকার তাদের মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে—এ্যাই, আমরাও দু আনা ভাড়া বাড়িয়ে দিলাম, তবু খেতে মিলছে না তেওয়ারীজি।

লেকিন পাঁচ সিকে জমায় হবে না আর, তেওয়ারীর থাকবে কী? দু টাকা পুরিয়ে দিতে হবে এবার থেকে।

হাঁ হাঁ করে উঠল গাড়োয়ান সহিসেরা—বিলকুল মরে যাবো, জানে মেরো না তেওয়ারীজি, হেই বাবু।

নয়ত ছেড়ে দাও আমার গাড়ী ; দু রূপেয়ার কম্‌তি হবে না ; আমি আপনার লোক দেখে লিব।

সাফ কথা বলে উঠে গেল দেলুয়া। বোকা বোকা লোকগুলো হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। গাড়ীটা যে ওদের নয় একথাটা কিছুতেই মনে থাকে না ওদের। কেউ মনে করিয়ে দিলে খুব কষ্ট হয় বটে, কিন্তু কথাটা সত্যি—যার জিনিস সে আপনার যা মন তাই করবে, কেউ দু কথা বলতে এলে শুনবে। গাড়ী যে দেলুয়া তেওয়ারীর। রমজানের নয়, রফিকের নয়, রহিমের নয়, গোলাম-আলির নয়। এককালে চাকায় রবারের টায়ার পরানো চকমকে গাড়ীর চেহারা আজকে মোটেই সুদৃশ্য নয়। পাদানির ওপর দরজাটা ট্যারচা হয়ে কাত হয়ে আছে। জানলার ওপর কাঠের ফ্রেমটা ভাঙা। ফাটা সিটের চামড়ার আস্তর জীর্ণ হয়ে নারকেলের ছোবড়া বেরিয়ে আসছে। চলতে গেলে রবারহীন ইস্পাতের সঙ্গে ধাক্কায নড়বড়ে ঠেকাঠুকো খোলটার যে কোন অংশ যে কোন সময় খসে আসতে পারে। তবু মিউনিসিপ্যাল লাইসেন্সের চৌকো ফ্রেমটাব ওপরে অনেকদিন আগেকার পুরনো শাদা রঙে লেখা আছে : মালিক—শ্রীদেলুয়া তেওয়ারী।

মালিক! বিষিয়ে উঠল রহিম। কেন গাড়ীটার নতুন রঙ করে নিতে যার মন নেই, ভাঙা তক্তাগুলো বদলিয়ে ভাল করে তুলতে টাকা খরচ যে কববে না, সেই কৃপণ টাকা-চাটা গিরগিটিটা হবে কিনা মালিক। লড়াইয়ের বাজার—কাঠের দাম কতো, পেরেকের দাম কতো, রঙের দাম কতো—হাজারটা ওজর তুলে রহিমের আবদার আটকেছে। জিনিসকে যে ভালবাসে না, সেই-ই হবে জিনিসেব মালিক?

পক্ষিরাজের গলা ধরে আদর করল রহিম। মনটাকে হালকা করে চাঙ্গা করে নিতে হবে। নিজের জন্যে দুটো ভাতের যোগাড় করতেই হয়রান হয়ে যাচ্ছে মানুষ—পেয়ারের ঘোড়াটাকে তোয়াজ করার সময় হয় না। ঘাড় থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলা হয়নি, গায়ের লোম থেকে আঁটুলি; কতো

রকম নালিশ জমিয়ে রেখেছে পক্ষিরাজ। আর বুকের ভেতরটা হিমহিম করে এল রহিমের। হাত দুটো হঠাৎ যেমন দুর্বল মনে হল : কী চেহারা হয়েছে পক্ষিরাজের !

বুড়ো হয়ে যাচ্ছে ঘোড়াটা, চব্বিশ বছরের রহিমকে যে রকম বুড়ো দেখায় আজকাল। ঢালু শক্ত বুক পিঠটা ফোঁপরা হয়ে ফুলে ঢপ্‌ঢপ্‌ করছে। গলাটা সরু হয়ে চোয়ালের জায়গাটা কড়া কুৎসিত দেখাচ্ছে। সাড়ে এগারোটার ট্রেন ধরতেই এত হাঁপিয়ে গেছে যে নিশ্বাসের ঝোঁকে সমস্ত শরীরটা রোগা রোগা চারটে পায়ের ওপর ক্রমাগত নড়ছে, সামনে পেছনে ঢালু ঘাড় বেয়ে মাথাটা ঝুঁকে এসেছে মাটির দিকে অবসাদে। আশেপাশের ছ্যাক্‌রা গাড়ীর ঘোড়াগুলো থেকে আলাদা করে চেনার উপায় রাখে নি আর।

ছেঁড়া খোঁড়া গলায় ডাকল রহিম—পক্ষিরাজ ? পক্ষিরাজ তাকাল ; ওর তাকানির মানে স্পষ্ট ; খেতে চায় ও। অনেকদিন ভাল করে খেতে চায় ও। অনেকদিন ভাল করে খেতে পায়নি কেউ, আকাল এসেছে যে দেশে। তাগড়াই যোয়ান মানুষই শুকিয়ে মরে যেছে রে বেটা ! দু দিন সবুর করতে হবে তুখে। খানিক কষ্ট হবে তুর। কিন্তু মন খারাপ করিস না বেটা—ফির চাঙ্গা করে তুলব আমি।

আস্তে আস্তে চাপড় মারল পক্ষিরাজের পিঠে। পেছনের দিকে তিনকোনা হাড় দুটো হাতে লাগল। তিনটে আঁটুলি খুঁজে খুঁজে বার করল রহিম। পায়ের হাড়ের ওপর শুকনো টান টান মাংসের ভাঁজগুলো ডলে ডলে আরাম দিতে চাইল পক্ষিরাজকে। তারপর খেতে দেবে বলে চানার বস্তাটা পেড়ে আনতে গিয়ে থম্‌কে গেল রহিম : চানা কই ?

চড়া বাজারে পক্ষিরাজের জন্যে বরাদ্দ আনা কয়েকে কিছুই হয় না। চামারটার কাছ থেকে বেশী পয়সা আদায় করা যায় না বলে রহিম নিজের

রোজগার থেকে কেটে পক্ষিরাজের চানার যোগান দিয়ে আসছে। কালকেও চানা কিনে আস্তাবলের কোণে ঝুলিয়ে রেখেছিল বস্তাটা।
চানা কি হয়েছিল বোঝা গেল বাড়ী ফিরে। চুপচাপ বসে থাকত, খাটত না, রোজগার করত না, রহিমের সেই বুড়ো অথর্ব চাচা বমি করছে ; আর বমির মধ্যে আস্তো চানার টুকরো। চুরি করে খেয়েছিস তুই ? বুড়ো লোকটার কাঁধ ধরে নির্দয় ঝাঁকুনি দিল রহিম—আমার ভাগের ভাত থেকে খেয়েও খিদে মেটেনি শালার ?
মারিস না বাপ রহিম, থোড়া খেয়েছি ভুখসে। এ বেটা রহিম—
ভুখসে ? পক্ষিরাজের পাঁজরার হাড় বেরুবে, আর বেঁচে থাকবে ঐ বেটা গোরস্তানের কুত্তা ? দ্বিতীয়বার ঝাঁকুনি দেয়ার আগে রহিম অনুভব করল, ওর শরীরের সমস্ত হাড় মাংস থেকে নিঃশব্দ দ্রুত একটা ঢেউ অস্পষ্ট গর্জন করে বুকের ফাটলে ফাটলে এসে জমেছে। বাঁধের পেছনে অন্ধকার বন্যার মতো উঁচু হয়ে উঠে নাক, চোখ, কপালের রগ অতিক্রম করে যাচ্ছে। কালো বোবা একটা আদেশ নির্দয় হয়ে উঠবে এখনি—
হিড় হিড় করে টেনে এনে ঘাটের মড়াটাকে দরজার বাইরে ফেলে দিল রহিম। বাঁশের খুঁটিটায় ছ্যাঁচড়ানো পাটা বেকায়দায় ধাক্কা খেল।
যা শালা ফ্যান চেয়ে বেড়া রাস্তায়, বড়ো মসজিদের দরজায় উপুড় হয়ে পড়ে থাক খোদাতালার কাছে !
পক্ষিরাজের দুশমনকে খুন করে ফেলতে পারত রহিম।
খুনীর ছেলে। ওর বাপ কোথাকার কয়েদখানায় আজো বন্ধ। তবু চাচাকে খুন করলে না ও। কেমন যেন টের পেয়েছে পক্ষিরাজের আসল দুশমন ও নয়। আর পক্ষিরাজের যে দুশমন, সেই তো ওরও দুশমন। অনেকবার সে আক্রান্ত হয়েছে, অনেকবার আহত হয়েছে সে নিজে। রহিমের চেহারায় হাড়ের কাঠামোটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আজকাল। কড়া

হাড়ের ওপর শিরার জটগুলো জাহান্নমের সাপের মতো। কালো রক্তের স্রোত জড়িয়ে জড়িয়ে আছে বহু মৃত্যুর আগেকার এক বাক্যহীন স্মৃতি। পক্ষিরাজকে তাজা করে তুলবে বলেছিল রহিম। কথা রাখতে পারছে না। সবুর কর, আরো কিছু সবুর কর, বেটা।

কতোদিন? বোবা চোখ তুলে আস্তাবলের অন্ধকারে জিজ্ঞেস করলে ঘোড়াটা।

দেলুয়া হাসল, ঘোড়াকে না ভালবাসলে মানুষ যে রকম ভাবে হাসে—বাংলাদেশের জলহাওয়ায় ঘোড়া তাজা থাকে কখনো। পাঁচ বছর গাড়ী টানলেই দাম উশুল হয়ে যাবে। বেঁচে থাকলে, সস্তা দামে বোকা খদ্দের ধরে বিচে দাও ব্যস—

ঠাহর হয় না রহিমের, চারদিকে কি হচ্ছে। শহর থেকে স্টেশন, স্টেশন থেকে শহর। একটা ট্রেন উঠে যাওয়াতে আজকাল তিন ক্ষেপ সওয়ারী। কৃচ্যা, কৃচ্যা, কৃচ্যা—বর্মা মুলুক থেকে যারা পালিয়ে আসবে, তাদের জন্যে শর, কাশ হোগলার ছোট ছোট খুপরী বানানো হয়েছিল ; সেগুলো ভরে গেছে ভিখিরীতে। চৌমাথায় বড়ো মসজিদের দরজায় ফ্যান চাইতে চাইতে মরেছে ওর চাচা। লোকে বললে দুর্ভিক্ষ শেষ হয়ে গেছে, এবার মহামারী।

কিন্তু নিমক ; নিমক মিলছে কোন্ দোকানে বলো ভাই। গাড়ীভর্তি ধান যাচ্ছে ধান-কলের দিকে। দর নেমে গেছে গো বারো টাকা মন।

কৃচ্যা—কৃচ্যা, কৃচ্যা—কলকাতা থেকে আনানো ওষুধের বাক্স দুটো গাড়ীর মাথায় চাপিয়ে পৌছে দিল ডাক্তারবাবুর বাসায়। ডাক্তারবাবু ঠাট্টা করেছিল, জানিস বাজারে ছাড়লে লাখ টাকা। স্টেশন যাবে স্টেশন। কিন্তু নিমক, মাইরী দু আনা বেশী দিব আমি, খানিক যোগাড় করে দাও মাইরী—

গফুরের মেয়েটাকে দেখে ভাল লেগেছিল ; কি যেন হয়েছে মেয়েটার, এত ভাল লাগছে কেন ? মাইরী, মাইরী ঠুঁটো কাপড় পরেছে বেটি, গতরের সবটা ঢেকে রাখতে পারে নি !

রফিক চাবুকের ডগা দিয়ে দেখাল—এ বে দেখেছিস ?

কি !

শালা সাইকেল রিকৃসা। রফিক চটে উঠছে।

আধখান সাইকেলের সঙ্গে বড়লোকদের বাড়ীর খোকাখুকুদের বেড়িয়ে নিয়ে আসার মতো একখান খেলা গাড়ী। দুজন তিনজন প্যাসেঞ্জার নিয়ে ছুটছে।

দেলুয়া দুটো কিনেছে। বলছে গাড়ীগুলো সব ভেঙে চুরে যেছে, ঘোড়াগুলো মরে যাবে দু দিন বাদে, এই ভাল।

ভাল ! হাসবার ইচ্ছে হল রহিমের, ঠোক্কর খেয়ে উলটিন যাবে যে রে—রফিক মোটেই হাসল না। রহিমের চাউনি এড়িয়ে বললে—পাঁচটা ঘোঁড়া বিচে দিবে দেলুয়া। তুর পক্ষিরাজকেও বিচে দিবে। নীলামে চড়াবে গাড়ীগুলান। বললে যে, যা দাম মিলবে তাথে নাকি সাতটা সাইকেল রিকৃসা কেনা চলবে।

রহিম উত্তর দিল না ; প্যাসেঞ্জার কাড়াকাড়ির জন্যে ব্যস্ত হয়েও উঠল না। আস্তে আস্তে কোচ্‌ম্যানের বাকৃস থেকে নেমে এসে দাঁড়াল পক্ষিরাজের পাশে। বুড়ো হয়ে গেছে পক্ষিরাজ, আর বুড়ো। চিকণ, মসৃণ ঝিলিক-দেয়া গায়ের লোম হয়ে গেছে ধুলোটে, কর্কশ পিঠের ওপর শিরদাঁড়ার হাড়গুলো গিঁটগিঁট্। গলাটা আরো রোগা হয়ে গিয়ে চোয়ালের হাড়টাকে অসহ্য করে তুলেছে। লম্বা কুমীরের মতো মুখটা মাটির দিকে ঝুঁকে। মেহেদি পাতা ঘস্‌ত যেখানে, শাদা লবঙ্গ ফুলের মতো সেই জায়গাটা কর্কশ লোমের দরুণ কুষ্ঠক্ষতের মতো দেখাচ্ছে। অনেক কাল

আগে সখ করে মাকড়ি পরিয়ে দিয়েছিল কানে; লোম উঠে উঠে সেই জায়গাটা নেড়ীকুত্তার তলপেটের চামড়ার মতো।

ক-দিন সবুর করব? বোবা চোখ তুলে ঘোড়াটা জিজ্ঞেসও করলে না। রহিমের মুরোদ বোঝা গেছে। নাকের ফুটো দুটো ছোট বড়ো হয়ে হাঁপানির টান-খাওয়া নিশ্বাস যাওয়া-আসার পথ করে দিল শুধু।

তুথে বিচে দিবে দেলুয়া!

এক মুহূর্ত থমকে রইল রহিম। তারপর অস্পষ্ট গর্জন শুনতে পেলে ও; নিঃশব্দে দ্রুত একটা ঢেউ বুকের ফাটলে ফাটলে ছড়িয়ে পড়ছে; নাক চোখ কপালের রগ বেয়ে খুলির তলে গিয়ে নিষ্ঠুর চাপ সৃষ্টি করে রইল। বাঁকা বোবা একটা হুকুম জাহান্নমের সাপের মতো হিসিয়ে উঠছে কোথাও।

রাত আটটার প্যাসেঞ্জার পৌছিয়ে রহিমকে কি একটা বলতে এসে বললে না রফিক। অন্ধকারে ওর আবছা মুখটা কি রকম দেখাচ্ছিল। গুলিখোর বুড়ো মিঞা গোড়ালি উঁচু করে হেঁটে যেতে যেতে থম্‌কে দাঁড়াল; তারপর বিড় বিড় করে বক্‌তে বক্‌তে সরে গেল সামনে থেকে—খুনী, জাত-খুনী বেটা—উর দিকে চাইতে ডর লাগে গো—আরো একটু রাত হতে ঝিঙেফুলী বাঘের মতো নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল রহিম।

মফস্বল শহরের প্রান্তগুলো ইতিমধ্যেই মরে যেতে শুরু করেছে। কেরোসিন তেলের দু-একটা বাতি দগ্‌দগ্‌ করছে অন্ধকারে। কয়েকজন মাতাল সৈন্য এখানে ওখানে টলছে। একটা মিলিটারি ট্রাক থাপছাড়া ভাবে থেমে রয়েছে রাস্তায়। কুইনিন কিনবার জন্যে ডাক্তারবাবুর কম্পাউণ্ডার পকেটে এক তাড়া নোট নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাইল দেড়েক দূরে একটা ফৌজের আস্তানা আছে, তাই এখানে রোজগার

হতে পারে বলে কয়েকটা মাগী জুটে পড়েছে কোত্থেকে। সোভান কনট্রাকটার একটা হারিকেন নিয়ে তার হারানো গরু খুঁজে বেড়াচ্ছে, কাল সকালে সেটাকে জবাই করে এরোড্রামের দৈনিক মাংসের বরাদ্দ যোগান দিতে হবে তাকে।

রহিমকে দেখে একটা মেয়ে খিলখিল করে হাসল—এসো হে পান খাও।

আরো এগিয়ে গিয়ে শুঁড়ির দোকানটায় থামল রহিম। রাস্তার ওপর চিৎপাত দিয়ে ঘুমুচ্ছে একটা লোক। আর একটা লোক দুই হাঁটু জোড় করে পাখীর মতো বসে বসে বিড়ি টানছে। রাত বেশী হয় নি বলে এখনও ভীড় জমে নি। রহিম একটা বোতল নিয়ে বসল। খুলির নীচে তীব্র নিষ্ঠুর চাপটা চরমে উঠছে আস্তে আস্তে। পক্ষিরাজের দুশমনকে দেখে নিতে হবে।

পাশের লোকটা একতরফা কথা বলে যাচ্ছিল ফিসফিস করে—টাকায় চাঁদি কোথাকে? ধরো দু আনা চাঁদি লাভ রইল মেরে কেটে; কিন্তুক কত হাঙ্গামা?

হু-হু গর্জন করে সেই স্রোত রহিমকে ছিঁড়ে ফুঁড়ে আগুনের হল্‌কা হয়ে সারা দুনিয়ায় নেচে বেড়াবে।

তাথে চাইতে এ্যাই একটো! চালাও তো কাম ফতে। লোকটা একটা পাঁচ টাকার জাল নোট রহিমের হাতে গুঁজে দিল, লাও চালিয়ে দেখো, প্রেত্যেক পাঁচ টাকায় তিন টাকা তুমার—

শেষ ঢোঁক মদ খেয়ে উঠে দাঁড়াল রহিম। মোটেই নেশা হয় নি। ফৌজের সৈন্যদের টুকিটাকি জিনিসের দোকান খুলে বসে আছে একটা লোক; সৌখিন ছড়ি, চামড়ার ব্যাগ, ক্ষুর, ফুলদানী নানা রকম জিনিস। একটা ছুরি বেছে নিল রহিম—কতো দাম?

আড়াই টাকা।

কুচ পরোয়া নেহি। রহিম পাঁচ টাকার নোটটা এগিয়ে দিল। গুনে গুনে ফেরত আড়াই টাকা ট্যাকে গুঁজল।

তারপর আশ্চর্য, রহিমের খুলির নীচে সেই রাক্ষুসী চাপটা আর নেই। ভাঁটির নিঃশব্দ টানে কোথায় সরে গেছে টের পায় নি।

হি, হি, লাও এবার, ছেলেবেলাকার খুকখুকে অভ্যাসে একলা একলা অন্ধকারে হাসল রহিম। এ শালা ভালই হল, একটো নোট চালাও, তিন টাকা তুর, হি-হি-হি—

যে মেয়েটি পান খেতে ডেকেছিল রহিম তাকে আপ্রাণ চেষ্টায় জড়িয়ে ধরেছে, পিষে মেরে ফেলতে চাচ্ছে একেবারে, পারছে না।

মেয়েটা রীতিমতো বিরক্ত হল: ওইই মিনসেটো কেমন ফুক্কুরি লাগালছে দেখ। পেটে ভাত পড়েনি, দেহে বল নাইকো, টাকা দেখিয়ে ফুক্কুরি মারছে দেখ—

গত দু বছরের বৃহত্তর দুর্ভিক্ষে তিলে তিলে কতোখানি প্রাণশক্তি ক্ষয়ে গেছে, রহিম জানত না। আহতভাবে বললে, জানিস খুন কবতে যেছিলাম দেলুয়াকে—

মেয়েটা বিরক্ত হয়ে ধাক্কা দিল রহিমকে—মিনসের দেমাক কতো!

ময়লা বিছানাটার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে রইল রহিম।

ভয়ংকর দেখাল—সামনের পা দুটো তুলে উঁচু হয়ে দাঁড়াল ঘোড়াটা। দাঁতের ফাঁকে লোহার কাটাটা কড়্ কড়্ করে ওঠে কামড়ে। ছোট ছোট লোমে চিকণ বিপুল বুকটা নীচের দিকে থাকার স্বাভাবিক সংস্থান ছেড়ে খাড়া হয়ে উঠে কেমন অপ্রাকৃত দেখায়। হিংস্র নাল-বাঁধা ক্ষুর দুটো শূন্যে ভেসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর, খুব কদাচিৎ যা ঘটে, ডাকল ঘোড়াটা।

গাড়ীটা বেঁকে বেঁকে অনেকখানি পিছু হটে এসেছে। সামনের চাকা দুটো ঘুরে গেল বেকায়দায়। সেখান থেকে লম্বা সরু এক জোড়া ডাণ্ডার ফাঁকে আটকা পড়ে রয়েছে ওটা। সেলাই করা গোল একটা চামড়ায় বাঁধা পড়েছে ঘাড়; উন্মত্ত লাল চোখ দুটো ঠুলির নীচে। দাঁতের ফাঁকে অসহ্য লোহার কড়াটা লাগামের সঙ্গে বাধা। সেলাই করা বিশেষ আকৃতির—গোল, চেপ্টা; সেলাই না করা, চিম্‌সে—চামড়ার একগুঁয়ে গন্ধ: ঘোড়াটা ডাকল আবার।

ক্যানিং স্ট্রীট

পেছনের একটা চাকা ঠেকেছে দালানের কোণায়। আর বেশী সরা চলবে না ওদিকে। পরিমিত টান দিয়ে লাগাম ধরে রইল জলিল। কোচ্ম্যানের বাক্সে বসে আছে অভ্যস্ত আরামে। প্রায় শাদা ভুরুর নীচে একজোড়া চোখ অতখানি তীক্ষ্ণ হয়েছে বোঝা যাবে না। বাঁ হাতে লাগামটা যে ভাবে ছিল সেই ভাবেই ধরে রইল। ডান হাতে চাবুকটা কিছুতেই নেবে না। অস্বস্তিসূচক পা নাড়তে পারত, তাও না।

টান পেয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ্ করে উঠল চামড়ার ফাঁস। গলার ঘণ্টি ঠুন্ঠুন্ করে উঠল—মিঠে। ঘোড়াটা আবার এক ঝাঁকুনি দিয়েছে।

হুঁশিয়ার জলিল! একজন সহিস্ তার নিজের ঘোড়াটার কাছে ছুটে গেল, মুখের কাছে লাগামটা ধরে ঠেলে দিতে চাইল পেছনে।

হারামী আছে ঘোড়াটা। জলিলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে লুঙ্গির খুঁটটা তুলে গুঁজল কোমরে।

খুলে নিয়ে যাও ঘোড়াটাকে, নয়ত এ-ও ক্ষেপ্বে—

ঠিক বাত্। ইস্মাইল মির্জাইর পকেট থেকে দেশলাই বার করে বিড়ি ধরাল তারপর খুলতে লাগল ওর নিজের ঘোড়াটাকে।

লে, শালা—লে, লে—দুরন্ত উৎসাহে একটা রোগা ঢেঙ্গা ছেলে কোত্থেকে এসে লাফাতে শুরু করেছে, লে এবার!

খড়ম পায়ে খট্খট্ করতে করতে দোকানের সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল মুটকী চীনে মেয়েটা। সরু গলায় জিজ্ঞেস করলে—

ক্যা হুয়া?

হুঁশিয়ার জলিল, ঘোড়াটাকে খুলে নিয়ে যেতে যেতে ইস্মাইল সাবধান করে দিল, হট্ যাও, হট যাও—চাট মারবে ঘোড়া—

ছোট একটা ভীড় একটু আলগা হয়ে আবার ঘন হয়ে এল।

পাগলা ঘোড়াটা আবার এক ঝাঁকুনি দিয়েছে—মড়মড় করে উঠল পিছনের

চাকাটা ! দালানের কোণ থেকে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে খসে পড়ল এক চাপ প্লাস্টার। ডান হাতে একবার চাবুকটা নিতে গিয়ে নিল না জলিল। বাঁ হাতে লাগামটার টানে একটু হয়ত তারতম্য ঘটল ! শাদা ছুঁচলো দাঁড়িতে এতক্ষণে মনে হল একটা নিপুণ মনোযোগ কঠিন হয়ে রয়েছে।

আব্বাজান।

জলিলের চার বছরের ছেলে উঁচু উঁচু হাত তুলে বাপকে আদর জানাল,—আব্বাজান, হামকো গাড়ীমে লে যাইয়ে গা !

তারপর শান্ত দেখাল ঘোড়াটাকে। মুহূর্তপূর্বের উত্তেজনাটা মরে গেছে মনে হল। ডান হাতে চাবুকটা নিতে গিয়ে নিল না জলিল।

আর কিছু হবে না—উৎসুক ভীড়টা ভেঙে চুরে ক্যানিং স্ট্রীটের স্বাভাবিক জনস্রোত হয়ে গেছে। চীনে মেয়েটা ইজিচেয়ারে এলিয়ে দিল শরীর, কালো কুর্তাটা তুলে মোটা পেটের ওপর ছেলেটাকে চাপিয়ে মাই দেবে এবার।

মনিহারী দোকানে নতুন প্যাকিং বাক্স খোলা হচ্ছে। রোগা ছেলেটা শব্দ করে শুঁকে নাকের ভেতর বাতাসটা টেনে নিল—সামনের রাস্তাটা প্যাক্-খোলা বিভিন্ন টয়লেটের গন্ধে এলোমেলো হয়ে গেছে।

শালা কেয়া খুশ্‌বা—এ হামিদ—সরু সরু দুই পায়ে কেমন একটা অস্বস্তি—লাফাতে শুরু করল।

ওহে তালাটার দাম কতো ?

দশ আনার মাল আট আনায়—দশ আনার মাল আট আনায়—দাগী গেঞ্জির স্তূপ থেকে একটা ছুঁড়ে দিল খরিদ্দারের ওপর।

এ কেয়া হায়, টুটা হায় !

যাও যাও বাবা হোগা নেই।

আপনি বাঙালী তাই আপনার কাছে আসি, এ পাড়ায়—বুঝতেই পারছেন

প্রতি গ্রোসে চার আনা আমার থাকবে, তাও যদি আপনি না দেন—
ব্যবসাদারি অবহেলায় মোড়কগুলো ওলটাল—নতুন কোম্পানী আপনাদের। মাল চালু হোক বাজারে—তারপর—
চালু হবে মানে? লড়াইয়েব বাজাবে— ?
দশ আনার মাল আট আনায়, দশ আনার মাল—
পুরোনো তালার ওপর আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে বলল—লোহার দর কি আর কমবে না?
নেহি নেহি বাবু, ও দরভি নেহি কমবে, আপ তালাভি নেহি লিবে—

ক্যানিং স্ট্রীটের জনস্রোত আবো এক জায়গায় গিয়ে থেমে গেছে। সেইখানে, জমাট মানুষেব নীরেট লাইনেব ভেতর রাবেয়ার মনটা উঁচু হয়ে উঠল—বাচ্চাটা! আভি ভুখসে কি করছে কে জানে!
বে-আব্রু মুখ রদ্দুরে টকটক করছে। কপালের ওপর এক গোছা কালো বাদামী চুল লেপটে গেছে ঘামে। বাড়ী ফিরলে জলিল কি হুজ্জোতই যে করবে! গাড়ী নিয়ে এ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে ওকে—শয়তানের চোখ আছে ওর কপালে।
ঘামে ভেজা মোটা দুই হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে বলছিল পাশের প্রৌঢ় মেয়েটা:
এক দফে বলে দাও দেব—ব্যস, দুনিয়াভব আদ্মী এসে পড়বে। বাপরে বাপ্ এতনা আদ্মী কাঁহাপর থা? 'হামকো দো,' 'হামকো দো,' বাপুরে বাপ—
এপাশের গাঁয়ের মেয়েটি রাবেয়ার কাঁধে ভীতু হাত রেখে শুধলো:
এলুমিনির বাসন দেবে বল্লে, তাই কামালপুর থেকে আসছি ছুটে। সেই ভোর হতে দাঁড়িয়ে রয়েছি, কই গা? কখন দেবে।

দেবে যখন মর্জি হবে।

রাবেয়ার গলার স্বরে এখনও কিছু তাজা আমেজ রয়েছে। কষ্ট? রদ্দুরে, ভীড়ে, ঠেলাঠেলিতে লাইনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার কষ্ট? হোক। সখের জন্তে কষ্ট সহ্য করবে না মেয়েমানুষ? সখই বা বলা যায় কেমন করে। বাচ্চাটা কি বড়ো হয়ে উঠছে না? তিনজন আদমীর খানা পাকানোর কোন বর্তন আছে ঘরে! জলিলের কি, হঠাৎ এক সময় বাড়ী এসে বলবে, খানা লাও; না আনলে—? ঘোড়া চালিয়ে চালিয়ে ওর মনটাই হয়ে গেছে ঘোড়ার মতো।

প্রৌঢ় মেয়েটা বলছিল—দেখো দুনিয়াকা আদমীর হাল দেখো। ঘেয়ো কুত্তার ওপর এত মাছি কখনও বসে?—হাত ঝাঁকাল; রদ্দুরে বালা দুটো ঝকমক্ করে উঠল না, খোদাই করা নক্‌সার কালো কালো ময়লায় কটু দেখাল শুধু।

আরে বাবা—এতনা মাল নেহি উস্‌কি দুকানমে। দো-চারজন ব্যস্—লাইন খতম্—

ভীড়ের ভেতর হঠাৎ ক্যানিং স্ট্রীটের অন্যরকম শব্দ ঠাহর করা যায়:

দশ আনার মাল আট আনায়, দশ আনার মাল আট আনায়—

খবরদার, খবরদার, ঠেলাওয়ালা ফিরছে অন্য লোকের মাল বয়ে।

সখ? জলিল তো বলবেই। জলিলের খাটো কুর্তাটার পকেট থেকে তিনটে টাকা বার করে নিয়েছে রাবেয়া। রাবেয়া নেবে না? ইস্ বললেই হল। মালিককে পাওনা জমার টাকাটা বুঝিয়ে দিতে হবে? তিন ক্ষেপ সওয়ারী নিও, কলকাতার ব্যবসায়ীদের কাছে পাহাড়ী রঙীন পাথর বেচে মন খুশি থাকবে ভুটানীদের—বখশিস চেয়ে নিও—তিনটে টাকা রোজগার করতে কত সময় লাগবে জলিলের? দূর থেকে ময়লা নোট তিনটে জলিলকে দেখিয়ে দেখিয়ে বলেছিল—একঠো চীজ খরিদ করব। চীজ্—মানে

এলুমিনিয়মের বাসন। তোমায় নতুন বাসনে আলুগোস্ পাকিয়ে দেব, তাড়ির সঙ্গে জমবে। কে যাবে কিনতে? জলিল জিজ্ঞেস করেছিল। কেন? রাবেয়াই যাবে। মেয়েদের জন্যে আলাদা লাইন হচ্ছে, জলিল তা জানে না? তেরে আব্বাজান নে বুদ্ধু হ্যায়? চার বছরের ছেলেকে আদব করেছিল রাবেয়া। কিন্তু অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে গেছে জলিল। মুসলমান বিবি বাইরে যাবে, একটা বোরখা অন্তত চাই। বোরখা? কেন, ছ-মাস আগে থেকে জলিলকে কি রাবেয়া মনে করিয়ে দেয়নি যে বোরখাটা ছিঁড়ে গেছে? ফালি ফালি ন্যাকড়াগুলো পর্যন্ত ঘরকন্নার হাজারো কাজে খাইয়ে দিয়েছে ও; এখন বললে কি হবে?

আফ্‌সোস্! দোকানগুলোয় এক টুক্‌রো কাপড় নাকি ছিল না গরিব লোকের জন্যে।

উজ্‌বুক ঠেলাওয়ালাটাকে পাকড়েছে ঘোড়ায় চাপা এক পুলিশ—এ শালা উল্লু—

ট্রাফিকের আইন-কানুনগুলো ভীষণ গোলমেলে; এ সব ক্ষেত্রে যা করা দরকার—দুই হাত কচ্‌লিয়ে অনুকম্পা ভিক্ষে করল লোকটা।

পুলিশ ব্যারাকের মাদী ঘোড়াটা কিন্তু ইতিমধ্যে লড়াইয়ের ঝাঁপ দেয়ার ভঙ্গীতে ঠেলাওয়ালার ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়েছে। তাজ্জা বে-আব্রু ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে দেখে ভয়ে শিটিয়ে গেল রাবেয়া।

মা গো, মানুষটাকে মেরে ফেললে গো; গাঁয়ের মেয়েটি জাপ্‌টে ধরতে চাইল রাবেয়াকে

ওদিকে হাঙ্গামায় রাস্তার একটা ভীড় মেয়েদের লাইনের ওপর ছিট্‌কিয়ে এসেছে। প্রৌঢ় মেয়েটা মোট একজোড়া হাতে কিল তুলল:

আঁখসে সুঝতা নেই? ইয়ে জানানা লোগোঁকি লাইন—কেয়া বেশরম মর্দানা—ভাগো ভাগো শালালোক—

মোটা বালা দিয়ে একজনের খুলিতে ঠুকে ঠুকে বাড়ি মারল। বাসন কখন দেবে ?

আব্বাজান, লে যাইয়ে গা হামকো গাড়ীমে ?
কিছুক্ষণ শান্ত দেখিয়েছিল ঘোড়াটাকে। তারপর যথাযুক্ত টান করে ধরা লাগামটায় প্রত্যাশিত ঝাঁকুনি খেল জলিল। পেছনকার দুই পায়ে খাড়া হয়ে উঠেছে ঘোড়াটা। প্লাস্টারের চাপ খসে গিয়ে একটা চাকা খোলা রাস্তা পেয়ে গেল। লাফাল ঘোড়াটা। সামনের বেকায়দা চাকা দুটো সোজা দিকে ঘুরে গেছে।
আব্বাজান···তৃতীয়বার ছেলেটি তার কথা শেষ করতে পারল না। পাগলা ঘোড়ার ক্ষুরের চাপে থেঁতলে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল পেটটা।
হুঁশিয়ার জলিল—সহিসটা আর্ত চীৎকার করে ছুটে এল—একটু দেরী আগেই হয়ে গেছে।
হায়, হায়, হায়, ইসমাইল তার ঘোড়ার মুখে চানাব থলিটা বাঁধতে বাঁধতে থমকাল—কেয়া কিয়া জলিল !
জলিল নড়ল না, আর্তনাদ করে উঠল না। পাগলা ঘোড়াটার শিরদাঁড়ায় অস্পষ্ট কম্পনের দিকে নজর পড়েছে এখন। পাকা ভুরুর নীচে চোখ দুটো জখম ছেলের দিকে চাইল না।
রোগা ঢেঙ্গা ছেলেটা ভীড়ের সঙ্গে এসে জুটেছে—কীসকো লেড়কারে তুম্ ? তারপর অভ্যাসবশে সরু সরু পা দুটোয় একটা স্নায়বিক উদ্বেগ অনুভব করেছিল। পরের মুহূর্তে লাফাতে শুরু করত, হাততালি দিত—ইসমাইলের ধমকে থেমে গেল।
দেখনে কি কেয়া হ্যায় ? কেয়া হ্যায় দেখনা ?
এম্বুলেন্স্—জলদি—

মণিহারী দোকানের মালিক দয়া করে কোন কম্বর্ঁার ভার নিলেন—বেচারী !

উ লেড়কাকো ছোড় দিয়া কৌন ?

ঘোড়ার মুখে আলগা করে লাগানো দানার বস্তাটা খসে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

ছুটে যেতে হল ইসমাইলকে।

কী আছে বাবা দেখবার ?

আ—হা !

খুন গিরতা বহুত্।

মোটা চীনে মেয়েটা একতাড়া ছেঁড়া ন্যাকড়া নিয়ে এসেছে—বাঁধো ওকে ?

সহিসটা ইতস্তত করল ; ছেঁড়া মাংস আর রক্তের ভেতর হাত দেবার সাহস ওর নেই। চীনে মেয়েটা নিজেই এগিয়ে গেল।

সহসা ছেলেটার জখম শরীর থেকে কেমন একটা মোচড়ানো আর্তনাদ বেরিয়ে এল ; আর ক্ষেপে উঠল ইসমাইল—শালা হারামী আছে, শালা ঘোড়া খুনী, তোমকো জান নিকাল দেগা—

ক্ষেপে গিয়ে একটা ডাণ্ডা নিয়ে এল কোথা থেকে, ঘোড়াটার মুখের ওপর মারতে শুরু করল অন্ধ আক্রোশে—এক, দুই, তিন।

খবরদার, কোচম্যানের বাক্‌স থেকে আদেশ বেজে উঠল জঙ্গী হাবিলদারের মতো। এই প্রথম কথা বললে জলিল।

তারপর ঘোড়াটা এক সময় শান্ত হল। কোচম্যানের বাক্‌সের শিকে নিপুণভাবে লাগামটা বাঁধল জলিল। নেমে এসে ঘোড়ার বাদামী পিঠে আদর করে হাত বুলিয়ে ডাকল—জিভ্ আর দাঁতের ফাঁকে বাতাস চেপে মিষ্টি মিষ্টি শব্দ করে। ঘোড়াটা চাট মারল না। ঘাড়ে নরম চাপড় মারল কয়েকটা। দাঁতের ফাঁকে লোহার কড়াটা কড়মড় করে

উঠল না। গাড়ীটাকে সরিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় টেনে আনল। সিটের তল থেকে দানার বস্তাটা বার করে খেতে দিল।

এতক্ষণে ছেলের কাছে এল ও। কি রকম মোটা মোটা কালো রঙের ন্যাকড়া দিয়ে ছেলেটাকে জড়ানো হয়েছে। ভেজা রক্তে কালো রঙটা ভয়াবহ। দুই হাত বাড়িয়ে ছেলেকে বুকে নেওয়ার ভঙ্গীতে এগিয়ে যেতে চাইল জলিল। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে পিরানের বোতাম ছিঁড়ে ফেলল ও, রোদে পোড়া মুখের চেয়ে অনেক ফর্সা ধবধবে লোমশ বুকটাকে লাল করে তুলল চাপড় মেরে মেরে, ধিক্কারে।

মেরে বাচ্চা!

তখনও এম্বুলেন্স্ আসেনি।

কেনা হল এ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি। পাশের প্রৌঢ় মেয়েটা রাবেয়ার ডেক্‌চিটা দেখে শুনে হিংসুটে হয়ে উঠল: দোকানদারটা বদমাস। রাবেয়ার খাপ্‌সুরত্‌ মুখ দেখে ভাল জিনিসটা দিয়েছে ওকেই। চক্‌চক্‌ করছে, পালিশ কি! যেন চাঁদি। ডেক্‌চির গায়ে রাবেয়ার মুখের ছায়া পড়েছে চেপ্‌টা হয়ে।

সখের জিনিসটা শেষ পর্যন্ত কিনতে পারা গেল দেখে খুশি হয়েছে রাবেয়া। পৃথিবীটা কেমন একধরনের ভালই ঠেকছে, এত হৈ-চৈ গণ্ডগোল, ব্যস্ততা, ক্যানিং স্ট্রীট—সব। বোরখার তল থেকে চুরি করে দেখা পৃথিবীর চেয়ে পৃথক। ঠেলাঠেলিতে ঘামে, সরু সুর্মার টান মুছে স্থূল কলঙ্ক হয়ে গেছে সেখানে, ডাগর চোখের মণিটা সেই জায়গায় টেনে এনে তাকাল—ঐ রাস্তাটা কী?

কলুটোলা।

অবাক হল;—আর ঐ রাস্তাটা?

চীৎপুর।

বড়ো মস্‌জিদ্‌ ; ভিখিরী , ফলওয়ালা ; চীৎপুরের বাঁকা ট্রামলাইন, মাথায় রুমাল-বাঁধা জীপ-মেয়ে খবরের কাগজ কিনল ; বেণীবাঁধা তিনটে ভুটানী ; ভিস্তিওয়ালা ,— দেখতে ভালই লাগে।

মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল রাবেয়া। হাতের ডেক্‌চিটায় কে যেন হঠাৎ এক টান দিয়েছে। তাকিয়ে দেখল কুৎসিত চেহাবার এক ইরানী মেয়ে।

কেত্‌না দাম লেওগী, বোলো ? ঘাঘরার ভাঁজ থেকে টাকায় ভরা মনিব্যাগ বার করল। বোলো—?

ব্যাপার কী ! দুই হাতে ডেক্‌চিটা আঁকড়ে ধরে পুরুষের-মতো-দেখতে মেয়েটার দিকে চাইল রাবেয়া। কাঁচের চুড়িগুলোয় আতঙ্ক বেজে উঠছে।

ব্যাদা দাম দেব, বেচবে না—?—তব্‌ যাও—রূঢ় ধাক্কা দিয়ে চলে গেল ইরানীটা।

আর এতক্ষণে ভয় পেল রাবেয়া। মনে পড়ল, মুসলমানের বিবি, আব্রু না মেনে রাস্তায় একলা বেরিয়েছে। দোকানগুলোয় নাকি গরিবের বৌ-এর জন্যে এক টুক্‌রোও কাপড় নেই। ছেঁড়া শাড়ীটা সামলে নিয়ে দ্রুত পা চালাল।

চটের পর্দাটা ত্রস্ত হাতে সরিয়ে জলিলকে দেখতে পেল, খাটের ওপর বসে আছে স্তব্ধ হয়ে। কৈফিয়ৎটা সাজানই ছিল—অনেক মেয়েই তো আজকাল বোরখা ছাড়াই রাস্তা হাঁটে ; তবু ফ্যাকাশে গলায় মিথ্যে হাসি টেনে বাজে কথাটাই বলল আগে—রহিমকে আব্বা, তোম একেলা ? মেরে বাচ্চা কাঁহা ?

হাসপাতাল।

জলিলের কথাটা কেমন কড়া শোনাল না কি ? জলিল উঠে দাঁড়াচ্ছে

কেন ? শুকনো চামড়া, ঘোড়া আর বুড়ো মানুষের ঘামের একটা মিলিত ঝাঁঝালো গন্ধ এগিয়ে আসছে রাবেয়ার দিকে ?
দুনিয়ার আদমী আজ রাবেয়ার বে-আব্রু-মুখের দিকে তাকিয়েছে, দুনিয়ার আদমী দেখেছে জলিলের বৌ ছেঁড়া কাপড় পরে দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তার লাইনে—পাগলা ঘোড়ার পিঠে যে চাবুক পড়েনি, সেই চাবুক পড়ল রাবেয়ার পিঠে, পায়ে, বুকে। বারণ করেনি জলিল রাস্তায় ঐ ভাবে যেতে ?
কভি নেই যায়ুঙ্গী, মেরে বাচ্চাকো ঘুমা দেও।
খাটিয়ার পায়া ধরে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদল রাবেয়া।

সন্ধ্যা নামল ; তারপর রাত্রি। কলুটোলা, ক্যানিং স্ট্রীটের রাস্তাটা কেমন অস্বাভাবিক নির্জন। পুরনো তালার বাক্স গুটিয়ে চলে গেছে তালা-ওয়ালা ; গেঞ্জিওয়ালা ; ইরানী। গলার শিরা ফুলিয়ে ফুলিয়ে যারা সারাদিন চীৎকার করেছে ; ছেলেপিলে সংসারের জন্যে রোজগার করেছে ; ঘা খেয়েছে, ঘা মেরেছে। বোবা-বাঁকা আবেগের আঁকিবুঁকি হয়ত কালো দাগ রেখে গেছে খোলা রাস্তায়। সেখানে ঠুলি-পরা গ্যাসের আলো প্রেত-সবুজ। মরা জানোয়ারের চোখের মত। দূরে, ঝাঁকার মধ্যে শরীর গুটিয়ে ঘুমন্ত কুলি। ব্যাফ্‌ল্ ওয়ালের পেছনে ভিনদেশী মেয়ে পুরুষ। দুর্বোধ্য রাস্তাটায় একটা ভুতুড়ে কাগজ উড়ে বেড়াচ্ছে বাতাসে। কাছেই কোথাও আস্তাবল রয়েছে, তারই বোটকা গন্ধ ভেসে আসছে, মিশে যাচ্ছে প্যাক-খোলা টয়লেটের হাওয়ায়। জলিলের অন্ধকার গাড়ীটার টিনের ছাতের ওপর হিম জমছে। লেজ নেড়ে নেড়ে মশা তাড়াচ্ছে ঘোড়াটা, তখন চামড়ার টানে একটা ক্যাঁচ্‌ কেঁচে শব্দ ঠাহর করা যাবে।

টলতে টলতে আসছে ওরা দুজন। ইস্‌মাইলের পা দুটো কিছুতেই খাড়া থাকছে না, বিশ্রীভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে কথাগুলো। যে দিলদরিয়া লোকটা তাকে এমন অযাচিত মদ খাইয়ে আনল তার সঙ্গে খুব, খুব মিষ্টি ব্যবহার করার ইচ্ছে হচ্ছে ওর। তোষামোদের মতো কয়েকটা কথা বলার ঝোঁক চাপছে।

আল্লার কসম্ জলিল, তোমায় আমি সর্দার বলে ডাকব।

জলিলের মাথাটা একটু বুকের উপর নুয়ে এসেছে। একটু বেশী ফুলো দেখাচ্ছে পেটটা। হাতের চাবুকটা দিয়ে হাঁটুর ওপর মাঝে মাঝে বাড়ি মারছে ও:

মালিককে কাল পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে। বদমাস বৌটা তিন রূপেয়া খরচ করে ফেলেছে।

থুথু ফেলল ইসমাইল—কুত্তা, বিলকুল কুত্তা আছে আমাদের মালিক—

হাঁটুর ওপর চাবুকের বাড়ি মারতে মারতে জলিল থামল একটু। খুব জরুরী কি একটা জিনিস বলবে ভাবছিল মনে আসছে না—

বোরখা ছাড়াই রাস্তা হাঁকড়ে বেড়াচ্ছে বৌটা।

কঠিন জান আছে তোমার সর্দার—মাতাল ইস্‌মাইল নিজের ঝোঁকেই বলে যাচ্ছিল—কিন্তু বিলকুল্ হারামী আছে আমাদের মালিক—রূপেয়া, রূপেয়া চাই ওর—ব্যস্—

না—কিছুতেই মনে আসছে না জলিলের। ঘামে-ভেজা থম্‌থমে মুখের ওপর দিয়ে হাতটা চালিয়ে নিয়ে মাথার ছোট চুলের ভেতর খসখস করে চুলকাল খানিক—জরুরী, খুব জরুরী কি একটা জিনিস সে ভুলে যাচ্ছে—আর উল্‌টে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল ইস্‌মাইল; মাতাল মানুষের মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার অভ্যাসে চরম ঘৃণায় আবার থুথু ফেলল ও—

পাগ্লা ঘোড়ার তলে হারামীটাকে একদফে চট্কিয়ে দাও সর্দার। আল্লার কসম !

চীৎপুর রোড্ থেকে একটি ফুলবাবু ও প্রসাধনকটু একটি মেয়ে ইশারায় ডাকল ওদের। মাতাল হলেও এসব জিনিস ওরা বুঝতে পারে। কোচম্যানের বাক্সে উঠে বসল জলিল। গাড়ী যে ভাড়া হবে এখন।
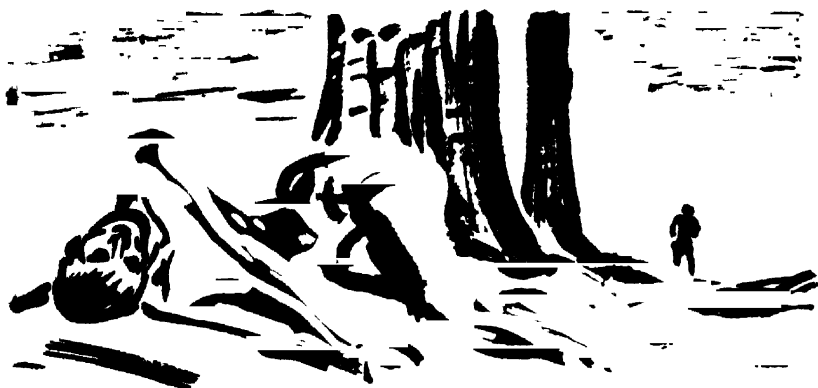
ক্ষেত মজুরের ঘরে, ছোটো ভাগচাষীর ঘবে নবান্নের ধান ফুরিয়ে যায় চৈত্র মাসেই। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ আর আষাঢ়ের কয়েকটা দিন শুকিয়ে থাকতে হবে মানুষকে। মহুয়া ফুল সেদ্ধ করে চৈত মাসটা চলে; কিন্তু বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস চালানো কঠিন। উঁচু নীচু পাথুরে জমিতে খাঁ খাঁ করে ওঠে আকাশ মাঠ। গাঁয়ে ঘরে কাজ থাকে না।

তারপর কয়েকজন যোয়ান লোক একদিন খুব রাগারাগি করে অকারণে। বৌ, ছেলে-মেয়েদের মারধোর করে। আর মাঝ রাতে বেরিয়ে যায়। খুব বেশি দূরে যায় না। দু-পাঁচ ক্রোশের ভেতর ঘোরাফেরা করে। পুকুর কাটাবে কেউ। রাস্তা তৈরী করবে সায়েব-সুবোরা। ছুটকো-ছাটকা কাজ মিলবে কোন বড় চাষী গেরস্তের বাড়ীতে। ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে আষাঢ়ের শুরুতে। কেনন৷ বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। জল জমেছে উঁচু নীচু শক্ত এঁটেল মাটিতে। চাষের কাজ আরম্ভ হবে এবার। বাকি লোকেরা কোথাও যায় না। কোথাও যেতে মন সরে না। এই দুই

কেলেপাথরী

মাস খিদে সহ্য করতে হবে। তা পারে। শীতকালের সাপের মতো একটা দীর্ঘ সময় শুকিয়ে থাকার অভ্যেস সহজ হয়ে এসেছে কেমন ধারা। শুধু বর্ষা পর্যন্ত। বর্ষায় গাঁয়ের মহাজন বড়ো চাষী এসে জল-ভেজা ক্ষেত দেখে যাবে। দেখে সন্তুষ্ট হবে। তবে ধান কর্জা দেবে। একটা গোলা খুলে ধানের মাপ চলবে কয়েকদিন ধরে।

ঘুমন্ত খিদে জেগে ওঠে তখন—আষাঢ়ের সঙ্গে সঙ্গে। অসুরের মতো পরিশ্রম করতে ইচ্ছে করে। আষাঢ়ে যদি বৃষ্টি না নামে তাহলেও, মহাজন যদি ধান কর্জ না দেয় তাহলেও।

পাঁচ কোনা চালের ভাত আমি একাই খেয়ে লিব। গ্রাসে গ্রাসে ভাত খেয়ে মুখ হাঁ করে হাসে বর্গাদার চাষীরা, কিসান মান্দেররা।

কেনে, আমি কত খাই তা বলো? ছ কোনা চালের ভাত খেলম তো পেট ভরল। না কি বলছ?

আর, এসব কথা তারা বলাবলি করে, কারণ গ্রামে গ্রামে কর্জা পাওয়া ধানের ভাত নুন দিয়ে খাওয়ার পরেও একটু খিদে থেকে গেছে। সবাই সহ্য করে সেটুকু।

•

রাঢ় দেশের ধু ধু মাঠের মাঝে কেলেপাথরী গ্রাম।

একটু দূরে ক্ষেতমজুরদের বাড়ীগুলো। বাঁকা ভাঙা মাটির দেয়াল। পুরনো ছাই রঙের চালে দু-চার গুছি নতুন খড় গোঁজা। আষাঢ়ের শুরুতে বৃষ্টির ভয়ে পাকুড় পাতা, পলাশ পাতা কেটে এনে চাপিয়ে দিতে হয়েছে নতুন করে। কিন্তু বৃষ্টি নামল না। এবার আশঙ্কায় খড়ির মতো মুখ করে ঘুরে বেড়ায় মানুষগুলো।

বৃষ্টি নামল না। তাই কাজ নেই। কোদাল ঘাড়ে করে বাগ্দীপাড়ার লোকেরা দু প্রহর বেলায় ফিরে ফিরে এল। তারপরে একদিন ধর্ম

ঠাকুরের ভাঙা ঘরের সামনে উঁচু হয়ে বসে হাঁপালে গঁবাই। কানে গোঁজা শালপাতার তৈরী আধপোড়া চুরুট নিয়ে নিঃশব্দে ধরাল বসে বসে।

খাটালি মিলছেক নাই।

না গো, মিলছেক নাই।

ঘর থেকে মেয়েরাও এল; তাদের কোলের ছেলেরা আঁকুপাঁকু করে মাই চুষছে। ন্যাংটো ন্যাংটো ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে রইল রোগা পায়ে।

না গো খাটালি মিলছেক নাই; মেয়েরা সুর করে সায় দেয়।

ডাকো তাহলে গুণীনকে, ডাকো, কয়েকজন পুরুষ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে কাজের তাড়া দিল; বলুক দেখি গুণীন, কি হচ্ছে?

হাঁ ডাকো কেনে?

বুড়ো গুণীন এল লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে। কালো কোঁচকানো চেহারা। রুক্ষু শাদা চুল মাথা ভর্তি। মহুয়া গাছের তলে দাঁড়িয়ে ছানি-পড়া চোখে এদিক ওদিক তাকাল গুণীন, বাতাস শুঁকল।

কি গো পেলে?

বাতাসের গন্ধ শুঁকে পুরনো দিনের মানুষটা বলে দিতে পারে বৃষ্টি হবে কিনা। উদ্‌গ্রীব হয়ে সকলে তাকিয়ে থাকে গুণীনের দিকে।

গুণীন মাথা ঝাঁকাল; না কিছুই নেই বাতাসে।

কিন্তু বৃষ্টি না হলে চলে? দেবতা কৃপা না করলে মরে যাবে না মানুষ? ক্ষেত-জোত জল পাবে না, ফসল হবে না? ধানকর্জা দেবে না মহাজনে?

শীতকালের সাপের মতো দুটো মাস শুকিয়ে থেকেছে। এখন ঘুমন্ত খিদে জেগে উঠেছে পেটের ভেতর। খাটুনির লোভে লম্বা লম্বা হাতগুলো দুলে উঠতে চায় সাপের মতো। কোদালের হাতল আঁকড়ে ধরতে চায়।

ঘরের দাওয়ায় একলা বসে গুণীন ঝিমোয়। খাটালি নাই। চলবে কি করে মানুষের। গাঁ ছেড়ে আবার বেরুতে হবে সবাইকে? গাঁ ছেড়ে, ধর্মঠাকুর ছেড়ে কোথাও সে যায় নি। কথনও না। সে গুণীন।

তু মরে যাবি গুণীন গাঁয়ে থাকলে—

সেবার যারা পালিয়েছিল তারা বলেছিল গুণীনকে।

গুণীন ধমক দিয়েছিল সবাইকে। সে ধমক তো একলা গুণীনের মুখ থেকে নয় ধর্মঠাকুরের মুখ থেকেও।

রাত্রে গুণীন দেখেছে পাথরগুলো কাঁটা কাঁটা হয়ে উঠেছে। ভাঙা চালের ফাঁক দিয়ে অন্ধকার তারাভরা আকাশের কষা আভা এসে পড়েছে ধর্মঠাকুরের পাষাণময় দেহে। ক্রোধ, দেবতার ক্রোধ, গুণীন দেখেছিল, অন্ধকার উত্তাপের মতো জ্বলছে।

সুচাঁদ এসে উঠোনের ধারে পা ছড়িয়ে বসে। গুণীনের ছেলে সুচাঁদ বাগ্‌দী। সতের বছর বয়সেই থাক্ থাক্ হাড়ে ওর চেহারা শক্ত যোয়ান হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাপকে, গুণীনকে ভয় করে ও। আর অন্ধকারে বসে বসে খিদে পায়, চরম খিদে, কেননা আষাঢ় মাস শেষ হতে চলেছে।

ভাত দে কেনে, অন্ধকারের ভেতর থেকে সুচাঁদ আচমকা ঘেঙাতে শুরু করে। অনেকখন ধরে ঘেঙায়। দূর থেকে এক সময় জঙ্গলের বুনো গন্ধ ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে ওঠে।

এক সময় গুণীন ভাতের হাঁড়িটা বার করে দেয় কাঁপতে কাঁপতে। গরুর মতো ঘঁৎ ঘঁৎ করে চুমুক টেনে মাড় খায় সুচাঁদ। হাত দিয়ে ছেঁকে ছেঁকে ভাত তুলে নেয়। খায়। তারপরেও খিদে থেকে যায়; সহ্য করতে পারে না কিছুতেই।

গুণীনকেও ভয় করতে ভুলে যায়।

আরো ভাত দে কেনে?

ভাত গুলান সব খেয়ে লিলি তাও বলছিস রে হতভাগা?

ভাত দে কেনে?

গোঁয়ারের মত রেগে বসে থাকে সুচাঁদ। এক সময় উঠে দাপাদাপি করে বেড়ায় সারা উঠোন। ভাত নেই জানে, তব্, তব্…। ধাক্কায় বাঁশের খুঁটির উপর থেকে তালপাতার ছাউনিটা বেঁকে ঝুলে পড়ে। রেগে শুয়ে শুয়ে মাটির ওপর হাত পা ছোঁড়ে সুচাঁদ।

ভাত দে কেনে?

অন্ধকারে সুচাঁদের গলার আওয়াজটা মানুষের মতো মনে হয় না।

গুণীন আর কিছু বলে না; গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে থাকে। আপন মনে আফসোস্ করে।

উ ছেল্যা…। হঠাৎ কিছু বলে না।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদল মেয়েরা। রাত্রে কখন তাদের স্বামী আর যোয়ান ছেলেরা পালিয়ে গিয়েছে। কেঁদে কেঁদে তারা শান্ত হল। কেননা, একবারে ঘর কেউ ছাড়েনি, একেবারে ঘর ছাড়তে পারে কেউ? ফিরে আসবে আবার, যদি না গাঁ ছাড়ার পাপে, বিদেশের জল হাওয়ার দোষে কাহিল হয়ে কেউ না মরে যায়। আবার ফিরে আসবে।

তাই কোদাল নিয়ে আর পুঁচকে ছেলে কোলে করে, আর ন্যাংটো ছেলে-গুলোকে পেছু পেছু হাঁটিয়ে তারা চলে গেল ঘুটিং খুঁজতে। শক্ত পাথুরে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে পাথুরে চুনের ঘুটিং বেছে তুলবে সবাই। এক এক টিন জমাতে পারলে দু কোনা চাল।

বুড়ো বাগ্‌দীরা কেউ কাঁদল না। কারণ জানত এরকম হয়। বার বার এরকম হয়ে এসেছে।

মহাজন ধান কর্জ দিবেক নাই, যারা যায় নি তারা বললো। তারপর আধপোড়া শালপাতার চুরুট টানল অন্যমনস্কভাবে।

একদিন বৃষ্টি হল। কিন্তু বেশীর ভাগ মেঘটা উড়ে গেল পুবে আর দক্ষিণে কয়েকটা মৌজার ওপর দিয়ে। ফাঁক পড়ল কেলেপাথরী গাঁ।

কিন্তু ওই বৃষ্টির ওপর নির্ভর করেই চাষ হবে। মহাজন একটা গোলার ধান খুলে দিল; পাচ শলী ধান মেপে দিল সেই গাঁয়ের দুজন ভাগ চাষীকে। খবর শুনে বাগ্‌দীপাড়ার কয়েকজন বয়স্ক লোক গেল দেখতে। শুধু দেখতে।

মজুত ধানের ধুলোর ভেতর বসে যে লোকটা মাপ করছে তার গলায় কেমন পুরনো সুর, রামে রাম—রামে দুই—দুইয়ে তিন।

কি বটে, তোদের কি বটে? ধান কর্জা হবে নাই, মহাজন রেগে মেগে বললে। আর ওরা কেউ জানত না যে মহাজনও কেমন ভয় পেয়েছে।

না, আমাদিকে তো আর ধান কর্জা দিবন নাই, তাই বলি, দেখি—

মহাজনের ঘরের সামনে উঁচু উঁচু হয়ে বসে রইল বাগ্‌দীপাড়ার লোকেরা। এমনি বসে রইল।

উয়ারা নামাল চল্যা গেল।

হাঁ উয়ারা…

হেই কালী সায়রে এক হাঁটু জল রইছে তো তোমার 'ক' বিঘে জমিতে ছিঁচ চলবে?

অযথা রেগে উঠে কেউ উত্তর দেয়—যা হোক ঘাসের পারা ধান হবে।

বললে—তোরা দুজন মুনিষ থাক হেথাকে, পালাস নাই।

কিন্তুক ধান কর্জা দিবেক নাই।

হেই ধান কর্জা দিবেক নাই? সবাই মিলে জিজ্ঞেস করে।

না তো। বললে, তোরা দুজন মুনিষ থাক হেথাকে, হাঁ।

দুজন মুনিষ থাক, কেনে আমরা দু কুড়ি ঘর বাগ্দী রইছি হেথাকে ?
হাঁ তো সে কথাটো কে বলবে ?
আর তারপরেও বসে রইল সবাই। কেমন ভয় পেল মহাজন। কিন্তু ওরা কেউ জানত না কেন ভয় পাচ্ছে। কি, কি বটে ? কর্জা-টর্জা হবেক নাই তো এই ঠেঁয়ে বসে রইলি কেনে ?
বাগ্দীপাড়ার কালো কালো বুড়ো বুড়ো লোকগুলো কেউ উত্তর দিল না। বোকার মতো তাকিয়ে রইল। তারপর জানোয়ারের মতো নিঃশব্দে ফিরে এল সবাই।

কেমন বুনো হয়ে উঠেছে সুচাঁদ। শ্রাবণ গড়িয়ে ভাদ্র পড়েছে, কিন্তু এক ফোঁটা মেঘ নেই আকাশে। কেমন বুনো হয়ে উঠেছে সুচাঁদ।
বাগ্দীপাড়ার মেয়েরা কালীসায়রের পাঁক থেকে আঁচল ভরে গুগ্লি নিয়ে এসেছে। উঠোনে পা ছড়িয়ে বসে গুগ্লি ভাঙে, তারপর আকাশের দিকে তাকায়।
চোখ ঝলুসে যেছে, সুর করে বলে। তারপর হঠাৎ সুচাঁদের দিকে চোখ পড়ে। ই মাগো, ই ছোঁড়াটো কী বটে !
কেমন বুনো হয়ে পড়েছে সুচাঁদ। বসে বসে কি যেন চিবোয়। কি খাচ্ছস ? কি খাচ্ছস রে খালভরা ?
হন্যে জানোয়ারের মতো হিংস্র ভয়ে সবুজ হয়ে চকচক করে সুচাঁদের চোখ। ঘাড় টান করে সরে বসে।
শালের কলি বটে, গোঁ গোঁ করে উত্তর দেয় সুচাঁদ। ভেজা-ভেজা পুরু ঠোঁটের পাশ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে, তুদের দিব নাই—
ই মাগো ! মেয়েরা চাপা গলায় আতঙ্কের শব্দ করে।
উ ছেল্যা··

হরিণমারির সাঁওতালরা পালিয়ে যাবার সময় হাঁক দিয়ে গেল বাগ্দী পাড়ায়। কেউ বেরিয়ে এল না। ভাঙা ভাঙা মাটির ঘর থেকে তালপাতার ছাউনি বেঁকে ঝুলে পড়েছে। আঙিনায় অব্যবহৃত মাটির উনুনে উড়ে এসে জমেছে জঙ্গলের শুকনো পাতা, জঞ্জাল। দূরে, পোড়া পোড়া ভাঙা হাঁড়িগুলো উপুড় করা।

দাওয়ায় ঠেস দিয়ে বসেছিল গুণীন একলা। চালসে ধরা চোখে ভাল করে দেখতে পায় না, কিন্তু গন্ধ পায়।

তুরা যেছিস ? কাঁপা ভাঙা গলায় ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করে।

কেনে যাবো নাই? তুর গাঁয়ের লোক সব পালাই গেল, কেনে যাবো নাই?

ফিস ফিস করে গুণীন আবার কি বলতে চাইল। গলার শিরা ফুলে উঠল কিন্তু আওয়াজ বেরুল না। সাঁওতালদের কালো কালো টান টান কুকুরগুলো কিছুক্ষণ ভাঙা হাঁড়িপাতিলের মাঝে মাঝে রুখে রুখে বেড়াল ক্ষেপার মতো। তারপর বিরক্ত হয়ে কাঁকুরে মাটিতে নখ গেঁথে গেঁথে ছুটে গেল আগে আগে।

হঠাৎ এতক্ষণে চালসে ধরা চোখে টের পায় গুণীন সমস্ত গাঁটা কেমন ভুতুড়ে হয়ে গেছে। দূর থেকে একটা হাঁ হাঁ হাওয়া পাথরে ঝাপটা মেরে মিলিয়ে যায় আকাশে। ভাদ্র মাসে পাতা ঝরে না: তবু যেন লালচে মাটি আঁচড়ে শুকনো পাতা উড়ে যাওয়ার খড়্ খড়্ শব্দ শোনা যায় কোথায়।

লাঠিতে ভর দিয়ে গুণীন প্রত্যেকের ঘরে ডাক দিয়ে দিয়ে এল। যোয়ান লোক দু-একজন ছাড়া কেউ নেই। তারাও সাধারণত ঘর থেকে বেরুতে চায় না।

চালসে ধরা চোখে গুণীন তাকাল। কিন্তু ওর চাউনি যোয়ান লোকগুলোর মুখের ওপর না পড়ে বাঁকা হয়ে মাটির ওপর এঁটে রইল তীব্রভাবে।

তুদের কি হল বল? তুদের মনে পাপ আছে!

যোয়ান লোকেরা অসন্তুষ্টভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—হেই গুণীন তুমি ঘর যাও। কি অভাব হয়্যাছে দেশে। না খেলে চলবে? তুরা পাপ করবি? আমাকে বল! গুণীন ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলে তীব্রভাবে।

হেই গুণীন তুমি ঘর যাও—

হাতে ধরে গুণীনকে তারা পৌছিয়ে দিয়ে এল বাড়ীতে।

ফাঁকা গাঁটায় মানুষ দেখা যায় না। পালিয়ে গেছে সবাই। যারা যায়নি তাদের মনে পাপ আছে, তারা কি করে কে জানে। মাঝে মাঝে শোনা যায় গরুর গাড়ীর চাকা চুরি করেছে কারা। কোঠাবাড়ির করোগেট টিন ভেঙে নিয়ে গেছে কারা। কখনও কদাচিৎ কোন অপরিচিত পথিককে একলা পেয়ে পাথরের চাঙ মেরে খুন করে ফেলেছে ডাকাতে। মহাজনের বাড়ীর গোলার পাশে রাত্রে ছায়া সরে যেতে দেখা গেছে।

হঠাৎ চৌকিদার নিয়ে একদিন মহাজন এসে উপস্থিত হল গাঁয়ে। বাগ্‌দীপাড়ায় ঢুকল না, দাঁড়িয়ে রইল একটু দূরে। আর চৌকিদারটাও এ গাঁয়ের নয়। এ গাঁয়ের চৌকিদার পালিয়ে গেছে!

বাগ্‌দীপাড়ার একটু দূরে দাঁড়িয়ে মহাজন চীৎকার করে বকাবকি শুরু করল। ভেতরে ঢুকল না।

পালাই গেল? পালাই' গেল গাঁ হতে! কিন্তুক বিষ্টুপুর গাঁয়ে গরুর গাড়ীর চাকা দুটো খুলে লিয়ে গেল কারা? পালাই গেল—

আর ভিন গাঁয়ের চৌকিদার খালি পায়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে এদিক ওদিক একটু ঘুরে এল, গাঁয়ে ঢুকল না।

এই চুরি ডাকাতি হচ্ছে, ই ভাল কথা নয়কো। পুলিশ ডেকে তুদের

গাঁ জ্বালিয়ে দিব, বলে দিলম। আমার ঘরকে আসিস্—উ ধান সরিয়ে ফেলেছি! দেখবি, যাস আমার ঘরকে। তুদের গাঁ জ্বালিয়ে দিব বলে দিলম। সড়কি, টাঙ্গি তৈয়ার রেখেছি বুঝছুস্? যাস্ আমার ঘরকে… বকাবকি করে মহাজন ফিরে চলে গেল, কিন্তু গাঁয়ে ঢুকল না। আর যোয়ান লোকেরা কেউ বেরিয়ে এসে মহাজনের কথার উত্তর দিলে না। আপন মনে তারা বিড়বিড় করে বললে—হোই, আপনার ঘরকে কেনে যাবো আজ্ঞা?

গুণীন বসে থাকে। না খেয়ে খেয়ে আরো কানা হয়ে গেছে সে, আরো কালা। কিন্তু না খেয়ে কাটিয়ে দিতে সে পারে। ধর্মরাজের গুণীন সে। গাঁয়ের লোক একটা ঋতু না খেয়ে কাটায়। গুণীন একটা বছর পারে হয়ত।

গন্ধ পায় গুণীন: সুচাঁদ আসছুস?

শান্ত ক্ষুধার্ত ঘোড়ার মতো সুচাঁদ এসে বসে; ঢেঙা আর ভীতু। বসে থেকে থেকে আচমকা বলে ওঠে—তুই জলটো করে দেকেনে তুই গুণীন বটিস?

ফিস্ ফিস্ করে গুণীন বলে—গন্ধ পেছি না, কিছু পেছি না, জল হবেক নাই…

তু গুণীন বটিস জলটো করেদে কেনে। গোঁয়ারের মতো সুচাঁদ ঝোঁক ধরে, তুর লেগে একটো ব্যাং ধরেছিলাম তো খেয়ে দিলম খিদের জ্বালায়—জলটো করেদে কেনে?

বৃষ্টি নেই আকাশে। দূরে ঢালু জমির গাঁয়ে কালীসায়রের বাঁকে দুনী ডুবিয়ে ছিঁচ করছে দুজন লোক। গত বছরের চষা জমির চাঙগুলো শক্ত পাথর হয়ে গেছে।

পেটের তল থেকে টান দিয়ে ফিস্ ফিস্ শব্দ বেরুল গুণীনের মুখ দিয়ে :
তু পালা সুচাঁদ, পূবে পালাই যা, মরে যাবি হেথাকে রইলে।
তু শোদ্ধ চল কেনে ?
গুণীন উত্তর দিলে না। বিড়বিড় করে কি বললে। ঠোঁট নড়ল শুধু।
হেই গুণীন তুই কি বিড়বিড়াইছিস্। চল কেনে ?
কেনে যাবো আমি, কেনে যাবো ?
গুণীন হঠাৎ তীব্র ভাঙা গলায় ককিয়ে ওঠে। বৃদ্ধ উপোসী বুকের ভেতর থেকে আওয়াজটা বেরিয়ে আসে একটা হিস্ হিস্ শব্দ করে।
সুচাঁদ ভয় পেয়ে দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ায়—হেই গুণীন ! বাপ্‌রে !
কানা গুণীন হঠাৎ উঠে টলতে টলতে হাঁটে একদিক পানে। চোখে দেখতে পায় না। কানে শুনতে পায় না, কিন্তু গন্ধ পায়। পুরনো পাথর মাটির গন্ধ। বাঁশের খুঁটির গা ঢেকে উইয়ের শক্ত বাসা। চাল উড়ে যাওয়া হাঁ-হাঁ-করা ধর্মরাজের দাওয়া।
কাঁটা দিয়েছে ঠাকুরের গায়ে। কানা চোখে তীব্রভাবে তাকিয়ে দেখে গুণীন ফিসফিসিয়ে উঠল। দেবতাদের ক্রোধ, প্রতিশোধ আর ক্ষমার সামনে দাড়িয়ে প্রকৃত পুরোহিতের চেহারাও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।
হেই গুণীন তু চল্—
সভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থেকে আকুলিবিকুলি করে ওঠে সুচাঁদ। অস্পষ্ট আবেগে একটা বুনো গোঁ-গোঁ শব্দ করে গলা দিয়ে। তারপর ছুটে আসে, জাপটে ধরে গুণীনকে। জোর করে পিঠে তুলে নিয়ে ছুটতে শুরু করে আতঙ্কে।
কেনে যাবো আমি কেনে যাবো ?
পিঠের ওপর বুড়ো গুণীন হাত পা ছুঁড়ে অসহায়ভাবে ব্যর্থ আপত্তি জানাতে চাইল, পারল না।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। পাথরে মাঠ চেপে একটা রোদপোড়া লালচে অন্ধকার। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা লাল সড়কের অপরিচিত গন্ধ নাকে এসে লাগে। অন্ধকারে একজন বিদেশী লোক হেঁটে আসছিল রাস্তা দিয়ে। ওদের দেখে থমকে দাঁড়াল : কে বটিস তুরা ?

উ গুণীন বটে আজ্ঞা ; আমি উয়্যার ছেল্যা—

আশ্বস্ত হয়ে লোকটা সরে এল ওদের কাছে। খানিক বসবে। ঘাড় থেকে চাদরে বাঁধা পুঁটলিটা নামিয়ে রাখবে। একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার হাঁটতে হবে। তাড়াতাড়ি গাঁয়ে পৌছনো ভাল। এ পথটা বড়ো খারাপ। অভাবে পড়েছে লোক।

চাষ হল না এবার। ভাপ্ উঠছে মাঠ দিয়ে......

আজ্ঞা দেবতা করলে নাই, সুচাঁদ সায় দেয়।

গুণীন একটা আধ-খালি চালের বস্তার মতো অসাড় হয়ে পড়ে আছে। কথা বলছে না।

পুবে চললম আজ্ঞা, বাপটো বড়া কাহিল হয়্যাছে......সুচাঁদ বলে।

বিদেশী লোকটা একটু ইতস্তত করে পোঁটলাটা খুলে দেয়—ছুটি মুড়ি আছে আমার ঠেঁয়ে, বলি, দেখো কেনে উ খায় তো ?

সুচাঁদ খাবলা দিয়ে টেনে নেয় মুড়ি কটি, নিজে খায় আস্বাদের শব্দ করে। তারপর ফুরিয়ে গেলে বলে—

আরো ছুটি দাও কেনে ?

আর নেইক আমার ঠেঁয়ে। সব দিয়ে দিলম।

দাও কেনে, ঘেঙাতে শুরু করে সুচাঁদ। কিছুতেই খিদে সহ্য করতে পারে না ও। আষাঢ় ভাদ্র মাস খুব খাটতে ইচ্ছে করে, আর খেতে। অন্ধকারে ওর ঘেঙানিটা হঠাৎ কেমন থম্ থম্ করে ওঠে। জঙ্গলের একটা বুনো গন্ধ ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে ওঠে।

কেমন ভয় পায় বিদেশী লোকটা। উঠে দাঁড়িয়ে বলে—চললম, আর নাইক বললম যি!

আরো দুটি মুড়ি দাও কেনে? ঘেঙাবার ভঙ্গীতে সুচাঁদ হাত বাড়িয়েছিল। ভয় পেয়ে পালাতে গেল লোকটা। ঘেঙানো হাত দুটো কোন্ সময় সাপের জাপটের মতো এঁটে গিয়েছিল লোকটার গলায়। একটা চাপা ঘড়ঘড়ে শব্দ অজান্তে বেরিয়ে এসেছিল সুচাঁদের বুক থেকে। ঢেঙা বোকা খাবার মতো আঙুল দিয়ে উলটিয়ে পালটিয়ে সুচাঁদ পরখ করল মরা লোকটাকে। তারপর বাপকে টেনে তুলল পিঠে।

এই সরানটো পূবে যাবে লয়?

কুঁজো হয়ে হাঁটতে হাঁটতে সুচাঁদ শুধোয়। পিঠের ওপর গুণীন কোন উত্তর দেয় না।

তু দেখেছিলি, উয়্যাদের ঘরে তিন মাড়াই ধান। তো মহাজন বললে কর্জা নাই ই বছর। ওই?···

দিবি নাই তো আমরা গাঁয়ে থাকব কেনে? পূবে খাটালি মিলছে, ওই পূবেই চললম। কালীসায়রে ছিঁচ করবে কজন মুনিষ, সে টো বলুক······

আপন মনে বকতে বকতে সুচাঁদ হাঁটে। লালচে অন্ধকার ঘন হয়ে চোখ ঢেকে রাখে।

কিছু দূর গিয়ে পিঠ থেকে গুণীনকে নামাল সুচাঁদ। আধভর্তি বস্তার মতো হুমড়ি খেয়ে পড়ল গুণীন। থ্যাবড়া হাত দিয়ে সুচাঁদ কাত-উপুড় করে দেখল অবাক হয়ে:

মরে গেইছে···

তারপর একাই হেঁটে গেল অন্ধকারে।
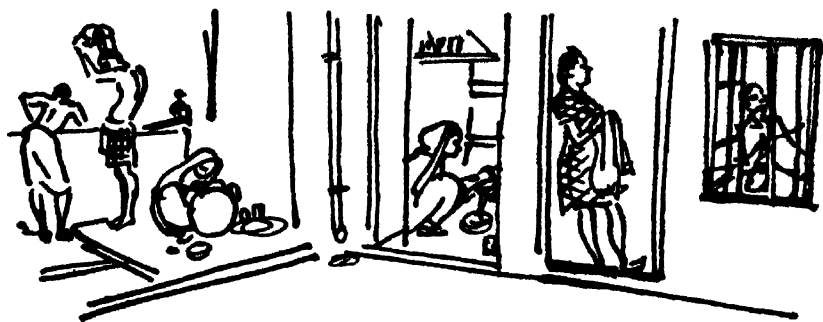
যেখান থেকে হাঁটতে শুরু করলে বড় রাস্তায় পড়বার আগে পাচটা গলি রাস্তা পেরোতে হয়, সেখানে চৌকো চেপ্টা বাড়ীর ভীড়ে মাঝারি গোছের পুরনো পলেস্তারা দেওয়া বাড়ী। হলদে রঙটা প্রথম যখন ফিকে হয়ে যেতে শুরু করে তখন কার্নিস গড়িয়ে নামা জলের আঁচড় চোখে পড়ার মতো ছিল না। তারপর নোনা ধরে ফিকে রঙটা জায়গায় জায়গায় প্যাঙাশে শাদা হয়ে উঠতে দেখা গেল, অন্যদিকে জলের আঁচড় গুলো কালো হয়ে উঠেছে। কালো আর পুরনো। আর জং ধরা পাইপের ধারে আটকে থেকে বেঁচে উঠেছে একটি ছোট অশথ গাছ। তবু তারপরেও অনেক কাল কেটে গেল।

তারপর কলকাতায় ভাড়াটের সংখ্যা বেড়ে গেছে। একতলা, দোতলা আর তিনতলায় ভাগাভাগি করে নিয়েছে এক একটি পরিবার এক একখানি ঘর। নিচের তলায় একটা ঘর এখনো অব্যবহৃত। একেবারে ভাঙা। অনতিদুরে বস্তি থেকে এক হিন্দুস্থানী মেয়ে সেই ঘরের দেয়ালে ঘুঁটে দেয়। বারণ করলে শোনে না। অন্য দুটো ব্যবহৃত ঘরের জানলায় বাতিল শাড়ির পর্দা ঝোলে। একটি সদর দরজা সব সময়েই ভেজানো থাকে।

একদিন ভাড়াটেদের একটি ছেলে একজন লোককে অনেক খোশামোদ করেছিল। লোকটা মই কাঁধে করে দেয়ালে দেয়ালে সিনেমার লাল-নীল পোস্টার এঁটে দেয়। ওদের দেয়ালেও একটা পোস্টার এঁটে দিয়েছিল লোকটা। আর ছেলেটা খুশি হয়েছিল। সে পোস্টারটাও ক্রমশ কালো হয়ে এসেছে।

এক একদিন রাত্রে খুব মেঘ করে। তেতলা বাড়ীর নিচের তলায় অন্ধকারে শোনা যায় অনেকক্ষণ ধরে একটা এরোপ্লেন ওড়ার ফাটা ভাঙা শব্দ। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে? শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে শব্দটা শুনে একটা বৌ বলে—কালকে আপিস থেকে আসার পথে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস কোরো, কেমন?
কি রকম নিশ্বাস আটকে রেখে বলে।
জিজ্ঞেস করবো, নিঝুম ক্লান্তিতে এলিয়ে উত্তর দেয় তার স্বামী।

তেতলার ছাতে দিন আসে প্রথমে। ভোর ভোর কুয়াশায় রং-চাপা সূর্য। চান করে ছাতে গিয়ে কাপড় মেলে দিতে ভাল লাগে তখন। কাপড় মেলে দিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ে একটা জায়গা ছিঁড়েছে। আরো বেশি ছিঁড়ে দিতে ইচ্ছে করে সেই জায়গাটা। তবু ছেঁড়ে না। ধোঁয়ার ভেতর সিঁড়ি দিয়ে কানা মানুষের মতো নিচে নেমে আসে।

ফিকে ছায়ায় খুকু বসে আছে খোকার মুখে ফিডিং বোতলটা ধরে। ছ-বছরের মেয়ে খুকু। গলাটা কেমন সরু দেহের আন্দাজে। এরই মধ্যে চোখ খারাপ হয়েছে। যে চশমাটা পরে, মুখের ওপর তা একটু বড়োই। স্টীল ফ্রেমের ছায়ায় মুখের কারুণ্যটা একটু বেশি ফোটে।

খাচ্ছে? খুকুর মা, মিনতি জিজ্ঞেস করলে।

মুখ তুলে চশমার ভেতর দিয়ে খুকু তাকায়। রোগা, ভালবাসা-কাঙাল। ছায়ার মতো একটা আলোয় ওর চেহারা জাগা মানুষের মতো নয়। অমনোযোগে দুধের শিশিটা খোকার মুখ থেকে সরে এল। মুঠো মুঠো হাত তুলে নড়ে ওঠে ভাইটি। চুষবার ভঙ্গীতে আঁকুপাকু করে ছোট্ট জিভ্‌টুকু। ভাল করে ধরে থাক, একটুও ধমক দেয় না খুকুর মা, মিনতি—খানিকটা দুধ বেশি করে দিতে পারলে খায়।

মা, রুনু না? রুনুর মা ওকে ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়ায়, মিট্ মিট্ করে খুকু বলে।

মিনতি হাসে, ভালবাসলে যে রকমভাবে মায়েরা হাসে।

আমার মাও তো আমাকে ঝিনুক দিয়ে দুধ খাইয়েছে—

তুমি? রোগা ঘাড়টা কেমন কাত করে চশমার ভেতর দিয়ে খুকু আবার তাকায়।

খুকুর মা মিনতি। বছর ছাব্বিশ বয়স। রোগা চেহারা। ছোট কপালের একপাশ দিয়ে খানিকটা চুল উঠে গেছে ছেলে হওয়ার পর। ঠোঁট দুটো চাপা।

বারান্দার কোণের দিকে অস্থায়ী রান্নাঘর। তোলা উনুনটা ধরে গেছে। ঘরের ভেতর থেকে রান্নার সরঞ্জাম এক এক করে নিয়ে আসে মিনতি। নিয়ে এসে একটু দাঁড়ায় ক্লান্তভাবে। তখন ওর দিকে তাকিয়ে মনে হবে ও একটু কুঁজোই হয়ত, একটু লম্বা।

তারপর কৌটো দিয়ে মেপে মেপে চাল নেয়। একটি চালও মাটিতে পড়ে না। খুকু একবার চাল নিতে গিয়েছিল। অনেক কটা চাল মাটিতে পড়ে গিয়েছিল—আর খুব ভয় পেয়েছিল খুকু। কিন্তু কিছু বলেনি খুকুর মা মিনতি।

জল দিয়ে পরিষ্কার করে ধুতে হবে রেশনের চালগুলো। ধুয়ে ধুয়ে কাঁকর বেছে ফেলতে হবে। খুকু পারে কিন্তু অনেক দেরী হয় তার।

পাশের ঘরে অন্য একটি পরিবার। দুই ভাই আর একটি বৌ সেখানে। বড়ো ভাই চাকরি করে। ছেলেটির নাম সুধীর, কলেজে পড়ে। কিন্তু প্রায়ই কলেজে যায় না। বৌদির অসুখ। অনেকদিন লম্বা একটানা অসুখ। কলেজে না গিয়ে বৌদির সেবা করে। কিছু হবে না সবাই জানে, তবু ভেতরে ভেতরে একটা দুর্বোধ্য অপরাধজ্ঞান খোঁচা মারে সব সময়, তাই স্টোভ জ্বালিয়ে পথ্য তৈরী করে, পাখার বাতাস দেয়, নিজেরা হোটেল থেকে খেয়ে আসে।

কালকে রাত্রে অনেকক্ষণ অবধি ওদের ঘর থেকে চাপা কথাবার্তা শোনা গিয়েছিল। বৌটার অসুখ বেড়েছে হয়ত। আজ সকালে বড় ভাই উঠে বেরিয়ে গেছে। সুধীর বৌদির পথ্য তৈরী করছে। দরজাটা অর্ধেক ভেজানো।

তেতলায় আইবুড়ো মেয়ে রমা কলতলার একটু দূরে দাঁড়িয়ে অকারণে গায়ে ময়লা শাড়ির আঁচল জড়ায়। কখন কলটা দখল করে নিয়ে স্নান শুরু করতে হয় বুঝতে পারে না। যুদ্ধের আগে কলেজ ছেড়েছিল। আশা ছিল বিয়ে হয়ে যাবে। এখন আশা আছে যুদ্ধের শেষে জিনিসপত্তর সস্তা হলে বিয়ে হয়ে যাবে। আর আশ্চর্য, কলেজ ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে ক্রমশ অদ্ভুত একটা লজ্জা চেপে বসেছে ওর মনের ওপর। পুরুষ মানুষের সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে পারে না। আগে পারত। কলতলার একটু দূরে দাঁড়িয়ে চান করার ঠিক সময়টা খুঁজে পায় না। গায়ে আঁচল জড়ায়। কুঁজো হয়ে যেতে ইচ্ছা করে।

ওপরের বিধবা কাকীমা হেঁট হয়ে কাপড় কাচতে কাচতে শুধোয়—কালকে সুধীর আর সুধীরের দাদা ঝগড়া করছিল নাকি?

উত্তর শোনার জন্যে কাপড় কাচা বন্ধ করে না।

ভাতের মাড় গালতে গালতে সুমিকে ধমক দিয়ে পাঠাল মিনতি—ওর শার্টটা এখনো সেলাই করে দিলি না ?
মিনতির বোন সুমি, বছর তেরো বয়স। ঢেঙা ঢেঙা গঠন। শাড়ির চেয়ে ফ্রক সস্তা, তাই ফ্রক পরেই চালাচ্ছে এখনো। বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না ওর ফ্রক-পরা শরীরেব দিকে। কেমন অসহ্য লাগে।
অবাধ্য মেয়ের মতো একটা বিরক্ত ভঙ্গী কবে উঠে গেল সুমি।
কড়াইয়ের তেল থেকে লঙ্কার ঝাল উড়ে আসছিল। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ ঢেকে মিনতি বললে—আর পারি না কাকীমা।
মা তুমিও ঝিনুক দিয়ে দুধ খেয়েছো ! খুকু আবার বলে ফেললে।
মিনতি এবার উত্তর দিল না।
বাবাঃ আপনাদের বিছানা কী ময়লা !
সুমির গলা শোনা যাচ্ছে। গিয়ে জুটেছে পাশেব ঘরে।
শার্টটা হাতে করেই গেছে। সেলাই কবছে দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে। ঐ অবস্থায়ই যতোদূর সম্ভব আড্ডা মারবে, মাতব্বরি করবে।
কী নোংরা, বমি আসছে আমার। বমি করে ফেলব কিন্তু—উত্তরে হঠাৎ পাল্টা চীৎকার করতে শুরু কবেছে সুধীর। সুধীরের গলাটা কি রকম রূঢ় মনে হল মিনতির কানে।
পরিষ্কার ? পরিষ্কার রাখতে গেলে কতো খবচ করতে হয় এর পেছনে ? একটা চাদর কতো কায়দা কবে চালাতে হয়। থাবড়া মারবো কিন্তু সুমি বেশি পাকামি করলে।
স্বামীকে ভাত বেড়ে দিতে দিতে কিছুক্ষণ থামল মিনতি। কলতলায় দুজন পুরুষ চান করছে। দোতলার বিধবা কাকীমা পাশে বসে হেঁট

হয়ে বাসন মাজছে। চানের জলে ভিজে যাচ্ছে কাপড় চোপড়, সরে বসার উপায় নেই।

সমস্ত শরীরটা কিছুক্ষণ শক্ত করে রাখল মিনতি, তারপর বললে—সুমি, ওদের বিছানার চাদর ময়লা হয়ে থাকলে তুলে নিয়ে আয়, আমি কেচে দেব।

দু বছর আগে হয়ত মিনতি একথা বলতে পারত না।

সুমি সেলাই করেছে কেমন বিচ্ছিরি, ট্যারা বাঁকা করে। তাই পরেই আপিস গেল মিনতির স্বামী।

তুমি দাড়ি কামাওনি? আনমনাভাবে বললে মিনতি। তারপর মনে করিয়ে দিল ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা।

একটি অল্পবয়সী বৌ বাটিতে করে কথনো তরকারী নিয়ে আসে অন্য একটি বৌয়ের কাছে।—হল না ভাই, তোমার মতো করে রাঁধার চেষ্টা করেছিলাম, হল না; খেয়ে দেখো।

আর তারপরে সহজেই জিজ্ঞেস করা যেতো অন্য বৌটি কি রাঁধছে। তবু করে না। ভাল মন্দ কেউ কিছু রাঁধলে তবেই তো ওরকম কথা জিজ্ঞেস করা ভাল দেখায়।

একটি খোকা কাঁদে। দুধের শিশিতে নতুন পানীয় ভরে শিশুকে কোলে নিয়ে চৌকাটে বসে বৌটি। বড়ো হয়ে ছেলেটা হয়ত রীতিমতো কালো কুৎসিত হবে দেখতে তবু তাকেই ভালবাসবে মা। কিন্তু বড়ো হবে তো? রোগা প্যাকাটির মতো টিম্ টিম্ করবে না তো কয়েক দিন পরে? মায়ের দুধ খেতে না পেয়ে রিকেট হবে না তো?

খুব কষ্ট হয়েছিল খুকু হওয়ার সময়। হলদে হয়ে গিয়েছিল গায়ের চামড়া। সবাই বললে বাঁচবে না বৌটা। তবু তো বাঁচলাম। আরো

কষ্ট হয়েছিল এবার, কিন্তু কেউ তেমন নজর দিলে না। এমন সময় পড়েছে দেশের! অন্য বৌটি খোকনকে যাচাই করে চোখ দিয়ে। তারপর যে কথা বলা দরকার তাই বলে—নেহাৎ পুরুষ্টু না হলেও খুব দুবলা চেহারা তো নয় খোকার।

নয়ত কিন্তু—

চোখভরা ভয় নিয়ে তাকায়—বুকের দুধ না পেলে? বাইরে বাইরে কোথা থেকে ছোট একটি মেয়ে ঘুরে এসে হাঁপায়। ছুটাছুটি করলে ছোট ছেলেমেয়েদের যে-রকম সুন্দর লাগে যে-রকম লাল হয়ে ওঠে পরিশ্রমে, তেমন নয়। ব্যবহৃত পশমের মতো কি রকম ছাই রং ক্লান্তি। কচি মুখে অদ্ভুত তীব্র লাগে।

কি রকম রান্না হয়েছে বলতে হবে কিন্তু। বৌটি মনে করিয়ে দিয়ে চলে যায়। পেছন ফিরতে দেখা যায় ছেঁড়া শাড়ি ন্যাতার মতো ঠুঁটো শায়ার ওপর ঝুলছে। টের পায়নি কখন ছিঁড়ে গেছে।

বুকের দুধ না পেলেও তো বাঁচে, অন্য বৌটি আপন মনে বলে।

ময়লা কাপড় জামাগুলো নিয়ে মিনতি কাচতে বসল কলতলায়। চৌবাচ্চায় অল্প এক চিলতে জল পড়ে আছে। কাপড় কাচার পর মিনতির চান করা চলবে না তা দিয়ে। পাশের ঘরের সুধীর টিউশানি থেকে ফিরে মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়াল।

বৌদি!

তারপর একটু ইতস্তত করল। ঠিক কি বলতে হবে বুঝতে পারছে না।

ইয়ে, আমি কেচে নেবো নিজে।

মিনতির হাসি পেল না। সাবান দেওয়াও বন্ধ করলে না। অপ্রস্তুতের

মতো দাঁড়িয়ে থেকে আবার বললে ছেলেটা—আপনার সব সাবানটুকুই খরচ হয়ে গেল।

তারপর কি রকমভাবে হাসল—জানেন তো, দাদার নোটিশ তো হয়ে গেছে? রিট্রেঞ্চমেণ্ট। ঘরটা ছেড়ে দেব। আপনাদের তো একটা ঘরে অসুবিধা হচ্ছে, অতগুলো লোক—

জবাব দিয়ে দিল? একটু থেমে মিনতি জিজ্ঞেস করলে।

হাঁ। এতো জানাই ছিল। চল্লিশজনকে ছাড়িয়েছে এবই মধ্যে।

তোমার পড়াশুনা?

দেখি; কি রকম ভাবে হাসল সুধীর।

কাচতে কাচতে শরীরেব ভেতবটা কেমন জ্বলে উঠল মিনতির। অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে সে। কি জানি কেন। নাড়িভুঁড়ি যন্ত্রগুলো নড়বড়ে হয়ে গেছে খোকা হওয়াব পর। সাবান দেওনা ভেজা কাপড়ের স্তূপের ভেতর দুই হাত ঢুকিয়ে ঠেকা দিয়ে রাখে মিনতি। আপিস ফিরতি ওর স্বামী ডাক্তারেব কাছ থেকে খবর জেনে আসবে।

সুধীর!

বলুন, ঘরের ভেতব থেকে সুধীর বললে।

তুমি তো খাওনি এখনো। হোটেলে গিয়ে দরকার নেই। ভাত আছে আমার।

দুপুব আসে গলিটাতে। নিচেব তলায় পর্যন্ত। একটি ছোট মেয়ে না ঘুমিয়ে জিনিসপত্র নাড়ে, ছড়ায়, কিন্তু ভাঙে না। অ[illegible]র ফাটা আয়নায় মুখ দেখে তবু জায়গা মতো রাখে। আর তখন দুপুরের প্যাটপেটে আলোয় ছেঁড়া শাড়িব পর্দাটা অসম্ভব বিচ্ছিরি লাগে। বিচ্ছিরি আর গরীব। পর্দাটা খানিক সরিয়ে ছোট মেয়েটি জানলার দিকে মুখ রেখে

তাকিয়ে থাকে। নোংরা বস্তা ঘাড়ে করে গলিতে ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে বেড়ায় একটা লোক। ডাস্টবিনের কাছে ঝুড়ি নিয়ে বসে থাকে একটা হিন্দুস্থানী বুড়ি। পোড়া কয়লা বেছে বেছে তোলে কয়লার স্তূপ থেকে। রাস্তার একটা হতচ্ছাড়া ছেলে কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অনেকদিনকার পুরনো পোস্টারটা ছেঁড়ে। ছিঁড়ে কোন লাভ হবে না, তবু ছেঁড়ে।
পাড়ার ভালমানুষ একটি পরিবারের কাছ থেকে কয়দিনের জন্যে চেয়ে আনা সেলায়ের কলের ওপর ঝুঁকে থাকে একটি অল্পবয়সী মা।
মা আমার খুব ইচ্ছে করে ঝিনুক দিয়ে দুধ খাই, মায়ের পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে তার মেয়ে। ছেলেমানুষি মুখেব ওপর অদ্ভুত একটা লজ্জা আর আড়ষ্টতা।
দুধ ?
তা নয়; শুধু ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে খুব। সেলাই করতে করতে নিজেকে শক্ত করে নেয় মা। ছি, হ্যাংলামি কোরো না খুকু—
তারপর সেলাই করতে করতে গলার স্ববটা একসময় কেমন গানের মতো হয়ে আসে। পুবনো দুঃখ মনে পড়লে যে রকম সুর করে কাঁদবার ইচ্ছে হয়—ছি খুকু-উ-উ···তুমি বড়ো হয়েছ না ?···না ?—একটুখানি দুধ আছে, ভাইটি খাবে যে! দুধ না পেলে কতো কষ্ট হবে ভাইটির। তোমায় দিদি বলে ডাকবে না তাহলে, ছি—খুকু-উ—
কি রকম গানের মতো হয়ে আসে।

একসময় পাশের ঘরে গেল মিনতি। সুধীর কলেজে যায়নি। বৌদিকে হাওয়া করার পাখাটা নিয়ে চুপ কবে বসে আছে।
তোমরা দেশে ফিরে যাবে ? আলগাভাবে বললে মিনতি। অসুস্থ বৌটা বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে শুয়ে আছে। চাউনিতে খড়িমাটির মতো

একটা শাদাটে ভাব এসে গেছে ওর। ওকে দেখে বোঝা যাবে না কিন্তু কষ্ট হচ্ছে কিনা, ভয় পাচ্ছে কিনা, পৃথিবীকে ভালবাসছে কিনা। অনবরত তাকিয়ে আছে শুধু।

দেশে গেলে আমি মরে যাবো, ফাঁকা বোকা চোখে মেয়েটি বললে। আর সবাই জানে কথাটা সত্যি।

না, মরবে না। দেশে গেলে যা হোক একটা হাওয়া-বদল তো হবে। সান্ত্বনার কথাগুলো সুধীর মুখস্ত করে রেখেছে।

আমি মরে যাব, মেয়েটি আবার বললে। সুধীর নিঃশব্দে পাখার বাতাস করতে শুরু করল।

একটা কিছু হয়ে গেলে বেঁচে যাই আমি, হঠাৎ অদ্ভুত চীৎকার করে বলে উঠল সুধীর, বেশ হয়েছে দাদাব চাকবি গেছে। খুশি হয়েছি আমি। কি হল এ্যাদ্দিন চাকরি করে! চুলোয় যাক সব। বেরিয়ে যাব একেবারে নির্ঝঞ্ঝাটে—বলতে বলতে তবু হঠাৎ থেমে গেল কি ভেবে।

কি খাই আমরা, সুধীরের কথাগুলো যেন শুনতে পায়নি বৌটা, রুগ্ন একঘেয়ে গলায় আপনমনে বলে চলেছে, কি খাই আমরা? দুধ, ঘি কে খায় আজকাল? মাছ? না খেয়ে খেয়ে এইসব। টেরই পাবে না, একটা কঠিন অসুখ হবে। এই তো বাড়ীটায় কটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে রয়েছে। দরজার ফাঁক দিয়ে শুয়ে শুয়ে দেখি, আর ভাবি কে দুধ খায় আজকাল—দুধ, ঘি, মাছ? ডাক্তার বলেছিল ফল খেতে, আমাকে বলেছিল, কিন্তু কে খায় আজকাল—

চুপ করুন, খুব দুর্বলভাবে বললে মিনতি।

রুগ্ন একঘেয়ে আওয়াজ থামিয়ে খড়িমাটি টানা চোখে তাকায় বৌটা।

অনেকক্ষণ পরে সুধীরকে জিজ্ঞেস করল মিনতি—তোমার পড়ার কি করবে? ঘরটা ছেড়ে দেবে ঠিক করে ফেলেছ?

চুপ করে বলেছিল সুধীর। পাখার বাতাসও করছিল না। এবার মিনতির দিকে তাকাল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

নিজের ঘরে এসে কিছুক্ষণ শক্ত হয়ে বসে রইল মিনতি। গলার ভেতর কি একটা আটকে রয়েছে। ফিকেভাবে খুকুর দিকে তাকিয়ে মিনতি একটু হাসল, কেন জানি খুকু মিনতির দিকে চশমার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছে। গলার ভেতর তবু কি একটা আটকে আছে। খোকাকে তুলে অন্যমনস্কের মতো আদর করতে শুরু করেছে মিনতি। বুকে চেপে ধরেছে, অথচ বুকে দুধ নাই ওর।

খুকু, মিনতির গলার স্বরটা কি রকম নিচু আর উদ্দেশ্যহীন শোনাল, ছোট ছোট ছেলেদের টিকিট দেয় ওরা, না।

উৎসাহিত হয়ে খুকু বললে—দুধওয়ালাবা? ওরা ভদ্রলোক না? আমাকেও টিকিট দেবে বলেছিল—

কতটুকু করে দুধ দেয় রে?

অনেক টেনে টেনে খুকু বললে, মা, ও বিলিতি দুধ, জানো?

আরো অনেক কথা বলার ইচ্ছে হয়েছিল খুকুর। একটা কালো অবাধ্য আর বিচ্ছিরি ছেলেকে খুকু দেখেছিল লাইনে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে। শান্ত রোগা রোগা ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি মারামারি করেছিল ছেলেটা। এক ঘটি দুধ ওর পাওনা, তা নিয়েও বলছিল আরো দাও। অন্যকে দেখিয়ে দেখিয়ে ঘটির কানা থেকে দুধ চেটে চেটে খাচ্ছিল আর খুব ফতি করছিল। খুব মিষ্টি খেতে বোধ হয়!

মা, ও বিলিতি দুধ, কি ভেবে খুকু আবার বললে। আর তখন নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করেছে মিনতি। কোন স্পষ্ট তীব্র দুঃখ না থাকলেও যে ভাবে মানুষ কাঁদে।

তারপর একদিন রাত্রে সকাল সকাল রান্না হয়ে যায় কয়েকটি পরিবারের। কি রকম গল্প করতে ইচ্ছে করে তখন, সিঁড়ির মুখে আর চৌকাটের ওপর বসে দাঁড়িয়ে অন্য লোকের গল্প শুনতে।

পাঁচটা গলি রাস্তা পেরিয়ে কলকাতা শহরের কোন বড়ো রাস্তায় ইস্কুল কলেজের ছাত্রদের ওপর লাঠি চালিয়েছে পুলিশে। এই পাড়ারই একটি ছেলে নাকি ফিরে এসেছে রিক্সা করে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে। তারই গল্প, তারই গুজব।

তেমন কিছু নয়। বোমা পড়েছে এ শহরে, ফুটপাথে মানুষ মরে থেকেছে। তার তুলনায় কতোটুকু ঘটনা! এ সংসারের প্রাত্যহিকতার কতো বাইরে! তবু কেমন অস্বস্তি লাগে ভেতরে ভেতরে। ভয় নয়; আশঙ্কা নয়—শুধু হাঁপ ধরে একতলার আঁকাবাঁকা মনগুলোয়।

হ্যা ভাই ভাল লাগছে না।

তাই বসে থাকে। আকাশের একটা কোণে তারাগুলো কয়লার কুচির মতো জ্বলে। বারান্দার আলোটা কে একজন নিভিয়ে দেয় কেউ আপত্তি করে না।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে তেতলার আইবুড়ো মেয়েটি অনেকক্ষণ আগেকার একটা কথার জের টানে—কলেজে থাকতে বইয়ের ভিতর একদিন দেখি একটা ইস্তাহার। কে রেখে দিয়েছিল কে জানে। ভাল করে পড়িওনি।

একটি বৌ বলে, আমার জ্যাঠতুতো ভাইকে কী ভয় করত জমিদার। বলত, চাষাভুষোদের নিয়ে দল পাকায়, এইসব ছেলেগুলো আমাদের না তাড়িয়ে ছাড়বে না।

একটি ছোট মেয়ে সিনেমা পোস্টারের কথা বলে। কে একটা ছেলে নাকি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে তা। ছোট মেয়েটির কথায় কেউ কান দেয় না।

আমার সেই জ্যাঠতুতো দাদা একদিন বাড়ী এল মাথা ফাটিয়ে। জানেন ও জমিদারেরই কাজ। লোকে বললে একেবারেই খুন করবে বলে ঠিক করেছিল।

আলগা আলগা অমনোযোগে গল্প চলে। সকাল সকাল রান্না হয়ে গেছে তাই। অনেক পুবনো, অনেক শোনা কথা। কিন্তু সিনেমার গল্প করতে ইচ্ছা করে না। সিঁড়িব মুখে তেতলাব আইবুড়ো মেয়েটা যাই-যাই করেও দাঁড়িয়ে থাকে। আর তখন সাত আটটি পবিবারকে পৃথক কবে চেনা যায় না আবছা আলোয়। মনে হয় ভাঙা যৌথ পরিবাব আবার যেন জোড়া লেগে পেয়েছে অন্য একটা তাৎপর্য। কযেকটা তাবা মিট্ মিট্ কবে।

বাত্রে খাওয়া দাওযা সেবে রুগ্ন বৌটাকে দেখতে গেল মিনতি। তেমনি ভাবেই তাকিযে আছে বৌটা। অনেক দুবে, বাগেব ভঙ্গী করে বসে আছে সুধীব। মিনতিকে দেখে খানিকটা সবে গেল সুধীরের দাদা। কি বলবে, তাই মিনতি জিজ্ঞেস কবলে—এ মাসটা তো আপনারা এখানে আছেন।

হা এ মাসটা—সুধীবেব দাদা আধখানা উত্তব দিল।

অনেক শযতানি আছে ওব মাথায়। আমি জানি। একদিন ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দেবে হয়ত। একঘেযে গলায মিনতিকে বললে বৌটা।

কি? কাকে?

ঠাকুব পো বলছে, তোমরা দেশে যাও, আমি থাকব এখানে। ও স্বদেশী কববে এখানে থেকে। আমি জানি ওর মতলব।

মিনতি সুধীরের দিকে তাকাল। ঘাড় গুঁজে বসে থাকাব ভঙ্গীতে একবোখা মনে হচ্ছে সুধীরকে।

স্বদেশী করলে লাঠি মারে পুলিশ, জেলে আটকে রেখে দেয়।

শোবার আগে স্বামীকে জিজ্ঞেস করার সময় পেল মিনতি—কিছু বলছ না যে ?

কি ? অপরাধীর মতো বললে মিনতির স্বামী।

কি বললে ডাক্তার ?

মাথাটা উঁচু করে কানা মানুষের মতো এদিক ওদিক চাইল মিনতির স্বামী—তেমন কিছু নয় সেরে যাবে, তাছাড়া—ইয়ে তোমার বোধহয় ছেলেপিলে হবে না আর। ম্যাল্ নিউট্রিশন্। তাছাড়া কোন ভয় নেই। ভালই হল, গরীবের সংসার—ঘরের ভেতর টুকিটাকি কাজ করে যাচ্ছে মিনতি। ছেঁড়া পর্দাটা গুটিয়ে এনে জানলার কপাট বন্ধ করল। বিছানাটা কাত হয়েছিল সোজা করে নিল। খোকার অয়েলক্লথটা পালটাল।

আমি তাহলে বাঁজা হয়ে গেলাম ? মিনতি একবার বললে। তারপর ঘুমন্ত সুমিকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিতে গিয়ে টের পেল জ্বর এসেছে ওর। ঢেঙা অসুন্দর মেয়েটার।

খুকু জেগে ছিল। নালিশ করার মতো করে বললে—মা সুমি, না,—ইস্কুলে কাসতে কাসতে রক্ত বেরিয়েছিল ওর। আমাকে বলেছে কাউকে বলিস না।

একটু চমকে উঠল বোধহয় কিন্তু বিছানা পাতা বন্ধ করলে না মিনতি। একটা বালিশ থেকে ছেঁড়া ময়লা একটা ওয়াড় খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল কোণে : কালকে কাচতে হবে।

আচ্ছা খুকু লাইনে দাঁড়িয়ে দুধ নিয়ে আসতে পারবে ? ভদ্রলোকের ছেলেপিলেরা যায় ওখানে ?

মিনতিব স্বামী উত্তব দিল না। বাল্‌বের আলো ট্যারচাভাবে মুখে এসে পড়েছে। দাড়ি কামানো হয়নি। চিবুকেব শেষের দিকে খানিকটা দাড়িতে পাক ধরেছে। কামানো মুখে বোঝা যায় না, এখন বোঝা যাচ্ছে।

কালকে ওব একটা টিকিট কবিযে দিও। বিনা পয়সার দুধ, তা আবার ভদ্র আব অভদ্র।

স্পষ্ট ধবা যাবে না, কিন্তু কোথায যেন একটা শক্ত ধ্বনি এসে গেছে মিনতিব গলাব আওয়াজে। শক্ত আব অপবিচিত।

আলো নিবিয়ে শুযে পড়লে মাব কাছ ঘেঁষে এল খুকু, অন্ধকারে রোগা ঘুম ঘুম গলায জিজ্ঞেস কবলে—মা তুমি কাঁদবে না, মা?

না, মিনতি বললে। খোকাব বালিশটা ঠিক মতো গুছিয়ে নিল।

আইনকে বলে রাইন, রামলালকে বলে আমলাল, ইটাহারকে বলে নিটাহার। ভাল করে কথা বেরোয় না মুখ দিয়ে। নেংটি-পরা মানুষগুলো —কেমন বোবাবোবা জানোয়ারের মত চাউনি।

আর কয়ডা মানুষ বাঁচি আছে মোড়ল গাঁওত্? মাথা ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলে জোতদার। দরকারী বক্তব্যগুলো দু-এক কথায় সেরে কারবারী মানুষের মতো শক্ত খবরদারি ভঙ্গীতে জানা খবর জেনে নেওয়া। মাথা ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলে।

নি আছে, বানসর উত্তর দিলে। তারপর অনাড়ী বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপসই দিল।

সাত বিঘা কোর্ফা জমি আছিল, এলায় দু বিঘা রহিল, সমঝো?

দু বিঘা···

বানসর সায় ছিল আনাড়ীর মতো। তারপর এলোমেলোভাবে অনুরোধ জানাল।

ওইডা জমি তো হামারই তাই কহছি মুই আধি করমু, ওইডা জমি···

মাথা ঝাঁকিয়ে সমিরুদ্দিন জোতদাব আবার প্রশ্ন করলে :

হাতিয়ার গরু সব বিচি খাসা ফেলছে, কিবষি কাম করবু কি দিয়া, বাপুরে ?

মাথা উঁচকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, আব তাব মানে তো আপত্তি কবলে। বানসব আর কিছু বলাব সাহস পায নি।

আঙিনায় সাবি সাবি একদল মানুষ বসেছিল জোতদাবের বাড়ী কাজ-কাম পাওয়া যাবে এই আশায়। অনেব আগেই জমি হারিয়েছে তারা। বানসরের দিকে বোবাব মতো চেয়ে বইল তাবাও। বিছু বললে না। ওদেব দিকে চেয়ে বুকেব ভিতরটা হিম হয়ে আসে বানসবেব।

মোড়ল গাঁয়েব সুমুখে পোড়া জমি। হাটেব লোক লোক্যাল বোর্ডের ভাঙা খালটানা বাস্তাব ওপব দিযে হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ অবাক হবে থামে :

হায়বে বাপ, কী জমি আছে!

বিস্তব। পেছন থেকে আব একজন আধিয়াব চাষী দাঁড়িয়ে পড়ে সায দেয়।

পতিত আছে, ফসল হয়া নি।

না, বিস্তব জমি, হায়বে বাপ—

কিই বা জমি—বড়ো জোব দু কুড়ি তিন কুড়ি বিঘে। তবু আফসোস করে। যতোবার হাটে যায়, ততোবাবই আফসোস কবতে ইচ্ছে করে। তাবা জানে। সামনেই মোড়ল-গাঁয়ের দিকে একবাব চকিত হয়ে তাকায়, তাবপব হঠাৎ জোরে জোবে হাঁটতে শুরু কবে।

ফৌৎ। গত আকালে ফৌৎ হয়ে গেছে মোড়ল গাঁ। জোতদারের জমি ভাগে চাষ করবে যারা তারা নেই। কেমন ধু ধু করে তাদের না-থাকা। উঁচু করে তৈরি করা মাটির দাওয়া হাঁ হয়ে গেছে। ছনেব চাল ভেঙে পড়েছে। বাঁশের খুঁটি ঢেকে ফেলে উইযের বাসা উঠেছে চাপ ধরে।

একটি হৃষ্টপুষ্ট মেয়েকে শুধু দেখা যায় ভাঙা ঘরগুলোর মধ্যে। বাদলসরের দশ বছরের মেয়ে ময়ালী। ধুলোয় বসে খেলা করে রাখাল ছেলেদের সঙ্গে অস-কস-সিঙে-বোঙা।

নতুন ধান ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গাঢ় হয়ে স্বপ্ন নামে। সে স্বপ্ন মিলিয়ে যাবে, টের পায় সবাই; তবু নামে। পুষ পরবের নেমন্তন্ন করে সবাই সবাইকে। লাল লাল চালের গুঁড়োর পিঠে খায় সবাই সবাইকার বাড়ীতে। সারা বছরের বেপরোয়া হিসাব করে। বিগত আকালের কথা কারো মনে নেই।

হাটে ধানের দর নামিছে চার টাকা।

ধরি রাখিমু ধান, বাপুরে ছাড়িমু না-ই ··

কিন্তু ঘোড়ায় চেপে ফড়িয়ারা এসে নানারকম আলাপ করে। তারপর দু দিন ঘোরাঘুরি করে আগাম টাকা দিয়ে চলে যায়। এখন ধান নেবে না, এখন শুধু টাকা দিয়ে রাখল।

হাটে চার টাকার ধান যখন ছয় টাকায় উঠবে তখন খালি বস্তা নিয়ে আসবে। ধান মেপে মেপে খালি বস্তা ভর্তি করে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে চলে যাবে।

জানে, তবু হঠাৎ দাদন নিয়ে নেয় সবাই। আর বিমর্ষ দেখায় না কাউকে।

গরু কেনা লাগে, খরচ পাতি ··

পরস্পরকে কৈফিয়ৎ দেয়। আর হাতে ধান পেয়ে, ফড়িয়ার কাছে আগাম দাদন নিয়ে সাহস বাড়ে মানুষের। কোর্ফা জমির খাজনা শোধ করে দেয়। নতুন জমি বন্দোবস্ত নেবার চেষ্টা করে বেশি সুদ কবুল দিয়ে। ঘোড়ল-গাঁয়ের পতিত জমিটার কথা মনে করিয়ে দেয় জোতদারকে।

মোড়ল-গাঁয়ের পাশের গাঁ শিবরাজপুর। দুজন মানুষ জোতদারের কাছারী থেকে ফিরে এল বোকাবোকা হাসিহাসি মুখে। লোক্যাল বোর্ডের রাস্তা থেকে নিচু আল বেয়ে নেমে এল ক্ষেতের মাঝখানে। একদিক দিয়ে ঢালু হয়ে গেছে জমিটা। ঢালু হয়ে কাঁদরের মতো হয়ে গেছে সেখানে। বর্ষায় অল্প জল জমে, কিন্তু নাগর নদীর বাঁধ না ভাঙলে ধান হয় প্রচুর। কাঁদরের কোল থেকে উঠেছে ডাঙা জমি। অর্ধেকটা চাষ হয়। খানিকটা পতিত যাবে জলের অভাবে।

কাঁদরের অর্ধেকটা নেমে গিয়ে শিবরাজপুরের একটা লোক কুঁজো ভঙ্গীতে ডানহাতটা বেমানানভাবে উঁচু করে সীমানা নির্দেশ করলে।

হোই উতি—কাঁদরের পুব পাক ছাড়ি সমানে চলি আসো এতি, তো এই সাত বিঘা জমি গিরস্তি করমু মুই।

গিরস্তি করবু তুই? তো করো! বা হাতে হুঁকো ধরে শিবরাজপুরের দ্বিতীয় লোকটা সারা শরীর ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সায় দিল, তারপর বললে নিজের কথা:

ছাড়ি দিনু এ পাকের কাঁদর। ধরো কথাটা হামার। আর কিবা, হোই উতি ডাঙা জমির নয় বিঘা। লাগায়ে দিনু আর কি···

কিছু ভাবতে ভয় পেয়েছে, কিন্তু সারা বছর অস্পষ্টভাবে অপেক্ষা করেছে বানসর। সারা শীত এ-গাঁয়ে ও গাঁয়ে ধান কাটা-মাড়ার কাজ করে বাড়ীতে দু-বিশ ধান জমিয়েছে। দেড় কুড়ি টাকা দাদন পেয়েছে পাইকারের কাছে। কিন্তু দেড় কুড়ি টাকায় গরু কেনা চলে না। গরু না কিনলে জোতদার জমি বন্দোবস্ত দেবে কেন?

বাইরে ধুলোর ওপর দশ বছরের মেয়ে মরালী খেলছে কয়েকটা রাখাল ছেলের সঙ্গে। গরু ছেড়ে দিয়ে তারা মোড়ল-গাঁয়ের পোড়ো দাওয়ায়

আড্ডা জমায়। কয়েকজন দুই হাত পেতে আছে মাটির ওপর। একটা ছেলে আঙুল গুণে চলেছে :

অন্‌-কস্‌-সিঙে বোঙা—

গোনা হয়ে গেলে কিল মারবে একসময়।

সারা সকাল আলসের মতো বসে বসে তামাক খেল বানসর। ময়ালীর দিকে তাকিয়ে চোখ মিট্‌ মিট্‌ করে ভাবল। খেতে বসে চটে উঠল হঠাৎ—

যাও, খাওয়া করো সব, আর কিছু করিবা নয়, খাওয়া করো আর কি। কেনে দিলু এইগুলা ভাত ? কত খাওয়া বাপুরে, কেনে দিলি তুই কহো !

দশ বছরের মেয়ে ময়ালী ছেঁড়া নেকড়ার বুকনিটা এক হাতে চেপে ধরে ভয়ে এঁটে থাকে দেয়ালের সঙ্গে। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে—

এইগুলো ভাত তো তোমার লাগিবে ই।

নি লাগে হমাক, নি লাগে কহি দিনু ! রাগে গরগর করতে করতে কৃপণের মতো ভাত খায়। দু দিনে তিনবেলা করে খেয়ে ধান ফুরিয়ে দেবার মতলব মেয়েটার।

দাদন নিছি না ?

কিন্তু বেশ শক্ত সমর্থ খাটিয়ে মেয়ে ময়ালী। গত এক বছরে হঠাৎ বড়ো হয়ে উঠেছে। দুপুরে রোজ শিববাজপুরে গিয়ে ধান কুটে দিয়ে আসে। ফেরবার সময় কাঠাখানেক ধান বেঁধে নিয়ে আসে আঁচলে। আরো বছর খানেক অপেক্ষা করলে বেশ শক্ত চেহারা হত ওর, দ্বিগুণ মেহনৎ করতে পারত। কিন্তু এত ছোটোতে বিয়ে দিলে নিন্দে করবে সমাজে।

কি করা, গরু কেনা লাগে।

তাই একদিন ভিনগাঁয়ের একজনকে বাড়ীতে নিয়ে এল বানসর। কথাবার্তা কইলে। পাঁচ কুড়ি পনের টাকা গুণে নিলে লোকটার কাছ থেকে।

খুব কান্নাকাটি করেছিল ময়ালী ; হাত-পা ছুঁড়ে আপত্তি জানিয়েছিল বোবা জন্তুর মতো।

কি করা !

হাট থেকে বেঁটে-খাটো এক জোড়া হালের গরু কিনে আনবার সময় শিবরাজপুরের লোকেরা চেপে ধরল বানসরকে।

নিন্দা করোছে, গাঁয়ের মানুষ, কামডা ঠিক হয়া নাই···

তবু, তেমন করে নিন্দা করলে না কেউ। অত ছোটোতে বিয়ে দেওয়া সমাজে চল নেই, এই পর্যন্ত।

নুকসান্ হইল কার ? তোরহি তো ? সমাজের কয়েকজন মাতব্বর বললে ; কিন্তু নিন্দে করার, শাস্তি দেবার জোর পেল না।

হাঁ, হামারি। বয়স কালে বিভা দিলে আট কুড়ি পণ দিত নিচ্চয়—খাটিবা পাবে ওমরা বিটি ছাওয়া—

নতুন কেনা গরুর চোয়ালের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দাঁত পরখ করতে করতে সায় দেয়।

তারপর আর অপেক্ষা করতে পারে না বানসর। ক্ষিপ্র চাঞ্চল্য নামে অলস জং-ধরা হাতে। নতুন গরুর জন্যে গোয়াল তৈরী করল সেই রাত্রে। খড় চেয়ে নিয়ে এল পাচ পণ। কাজ সেরে নিজের ঘরে উঠে এসে বসে রইল বুড়ো শেয়ালের মতো।

ময়ালী নেই। কিন্তু গোয়ালে নতুন কেনা গরু দুটো ফঁস ফঁস শব্দ করে ঘুমুচ্ছে।

হামার জমি ওইডা। আধি দেন হামাক, গরু আছে—হামার জমি—কাজের ভেতর বকতে শুরু করে বানসর।

সকালে উঠে তিন ক্রোশ মাটি হেঁটে গিয়ে উঠল জোতদারের বাড়ী। আঙিনায় সারি সারি গোলা এখনও বাঁধা হয় নি। কাঠে আছাড় মেরে মেরে ধান ঝাড়াই করছে দিন-মজুররা। সব জায়গায় কাজ শেষ হয়ে গেলেও এখানে বৈশাখ মাস পর্যন্ত ধান ঝাড়াই চলবে। জোতদারের ধান আছে কতো।

ক্ষেত মজুরদের ভেতর বসে বসে তামাক খেল বানসর। ওদের দিকে তাকাতে আজ আর কেমন ভয় করল না। তারপর আবছাভাবে হাসল।

আসিনু আর কি, একডা কাম বাধি গিছে।

ধানের গোছা ধরে বাড়ি মারতে মারতে কয়েকজন পাইট কেমন ভাবে তাকাল বানসরের দিকে, কিছু বললে না। আবার ধানের গোছা তুলে নিয়ে আছাড় মেরে চলল। জোতদারের ধান।

ফিরে যেতে ঘিরে ধরল শিবরাজপুরের লোকেরা।

কয় বিঘা বন্দোবস্ত হইল?

ছয় বিঘা—বানসর ভয়ে ভয়ে বললে। জোতদারের সামনে জানোয়ারের মতো দাঁড়িয়ে থেকে গলা কাঠ হয়ে গেছে ওর।

কটকটা বুদ্ধি ওমার, জোতদারের!

লিখাপড়া হয়া গেল সব?

নি লাগে লিখাপড়া। কহছে কি, করো। সন্দেহজনকভাবে মাথা দোলায় ওরা।

কহছে কি করো কিরষি কাম? *

হাঁ করো!

কিছুক্ষণ বিবেচনা করে শিবরাজপুরের লোকেরা শেষ পর্যন্ত আসল কথাটা পাড়ল :

কিন্তুক কতো কবুল দিছুরে তুই। লোভ করি বেশি বেশি কবুল করছ নিচ্চয়?

বেশি করি কেনে কহিমু, ধরা গলায় বোকার মতো নিজেকে সমর্থন করে চলে বানসর, যা দিবা হইবে তাই দিমু। কেনে কহিমু বেশি করি ? শিবরাজপুরের লোকেরা কিন্তু ছাড়ে না। অনিশ্চিত জমিটুকুর লোভে লোভে তারা নিজেরাও যে বেশি করে কবুল দিয়ে এসেছে।

কি কথা হইল কহো শুনি, কি কথা ?

ধান তুলি দিবা হইবে জোতদারের খালানে। আধাআধি আর কি—

আর গোলা মোছানি ?

হঁা দিবা হইবে ছু কাঠা।

ধান তোলানি ?

দিবা হইবে।

গোমস্তা সেলামী ?

দিবা হইবে।

হায়রে বাপ !

হঠাৎ আর জেরা করে না শিবরাজপুরের লোকেরা। তারা জানে। তারপর কিছুক্ষণ ঝিম ধরে থেকে তবু অকারণে খুশি হয়ে ওঠে। রাস্তার ঢালু থেকে পতিত জমিটার দিকে চেয়ে সার্থক মনে হয় সব কিছু। ঢালু জমি আরো ঢালু হয়ে কাঁদর হয়েছে। ছু পাশে ডাঙা জমির পিঠ। বর্ষায় অল্প জল জমবে এখানে। প্রথম বৃষ্টির এই জল বেশি না হলে ফসল হবে কতো ?

করো, আধি করো…

চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ—খাঁ খাঁ করবে মাঠ আকাশ। শুধু কয়েকটা ক্ষেতে ধুলোয় লুটোপুটি খাবে ভাদই ধানের চারা। সব ক্ষেতে নয়। আর সে সব ক্ষেত অপেক্ষা করে থাকবে আষাঢ়ের জন্যে। বৃষ্টির জন্যে।

খুব কষ্ট এ সময়। আধিয়ার চাষীকেও কাজ খুঁজতে বেরোতে হয়। কাজ পাওয়া যায় না। ঘরের ধান ফুরিয়ে এসেছে। হাটে দর উঠেছে আট টাকা।

হঠাৎ পাইকাররা এল ঘোড়ায় চেপে, খালি বস্তা বেঁধে নিয়ে। আধিয়ার কৃষকের বাড়ীর সামনে ঘোড়া বেঁধে আঙিনায় এসে হাঁক দিল—

বার হয়া আসেন বারে—

বেরিয়ে আসতে হবে তখন। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। খাতা দেখে ঠিক নাম খুঁজে বার করবে ওরা—

দেড় কুড়ি দাদন দিছি ; চার টাকা দরে সাড়ে সাত মণ—

ধান তো ফুরায়ে ফেলছি···

এইডা কথা নি শুনি বাপুরে, দাদন দিছি তিন মাস আগোত—

আর যা ছিল মাপ করে নিলে সব। তবু কম পড়ে গেছে। এক মণ খানেক কম।

পাইকার ছাড়লে না। ঘরের ভেতর ঢুকে কোথা থেকে একটা ধামা বার করে আনল টেনে।

সবটুকু মাপ করে নিল।

ওইডা ছাড়ি দেন হামাক, এই ফসলে তুনো করি শোধ দিমু, ছাড়ি দেন। আথালি পাথালি মিনতি করলে বানসর।

না হয়···

পাইকার নিঃশব্দে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে ফোলাফোলা ভর্তি বস্তা চাপিয়ে নিল। বাঁশঝাড় থেকে একটা কঞ্চি ভেঙে এনে নিজে চেপে বসল তার ওপর।

ছাড়ি দেন হামাক··

আনাড়ীর মতো কয়েকবার চীৎকার করে থেমে যেতে হল শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু আকাশ জুড়ে মেঘ করে থাকবে একদিন। সুপুষ্ট ধান গাছের মতো কালো মেঘ। তখন ভয় করবে না কেউ। তখন কর্জা চাইলে কর্জা দেবে জোতদার। তখন ভয় করবে না কেউ।

এই কয়েকটা দিন না খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছে বানসর আষাঢ়ের অপেক্ষায়। আষাঢ়ে কয়েকদিন বৃষ্টি শুরু হতেই ভোর বেলা লাঙল কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বানসর। রাস্তার ওপর থেকে দেখা যায় মাঠে মাঠে নেমে গেছে নেংটি-পরা লোক। সংক্ষিপ্ত আলাপ চলে।

হাল চাষ একডা না দিয়া থাকিবার নি পারিমু।

নি পারিমু।

কেউ দাঁড়ায় না বেশিক্ষণ।

হেই-হেই-হা-হা-হা···

হালের গরুকে তাড়া দিল শক্ত হাতে। একটা আশ্চর্য ক্ষুধিত উৎসাহে বানসর লাঙলের ফলা সোঁদা মাটিতে চেপে ধরেছে কুঁজো হয়ে। এক বছরের পতিত জমির শক্ত আস্তর ছিঁড়ে খুঁড়ে চলেছে। এক বেলা খেটেই হাঁপিয়ে পড়ে গরু আর মানুষ।

সন্ধ্যাবেলায় শিবরাজপুরে এসে জুটল সবাই, বানসরও। চীৎকার করলে সবাই।

বর্ষা হইল কি না হইল? তো এলায়কার মুরখীত্ ধান আছে, কহো—

নি আছে। তো কহো কার মুরখীত্ ধান আছে, সেইডা জানবার চাহছি—

তো চলো কর্জার কথা তো কহিবা হইবে···

জোতদার তাকিয়ে দেখলে ওদের সবাইকে। তারপর বললে:

কবালা চাই, কবালা—কবালা।

কবালা?

হাঁ গো কবালা। বিটি-ছাওয়ার কানে সোনাদানা আছে, গরু বাঁধা থুবার পার?

নি আছে, শুঁই শুঁই করে এক সঙ্গে বললে সবাই।

তাহলে কর্জা নেই। যদি গরু বাঁধা রেখে টিপসই দিয়ে যায়, তা হলে দেবে। এখন চাষবাস করুক, শোধ দিতে না পারলে ক্রোক করবে। দু-বিশ ধান দেবে, পৌষ মাসে শোধ দিতে হবে চার বিশ করে। কবালায় কিছু লেখা থাকবে না। শুধু টিপসই দিয়ে গেলেই হবে।

শুঁই শুঁই করলে সবাই, তারপর টিপসই দিয়ে কর্জা নিয়ে এল। জোত-দারের দাওয়ায় কাদামাখা ক্ষেত-মজুরেরা কেমন অদ্ভুতভাবে তাকিয়েছিল ওদের দিকে; ওদের দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতর হিম হয়ে আসে বানসরের। ফিরে যাবার সময় বকতে বকতে গেছে সারা রাস্তা:

চায়া আছে হামার পানে। ক্যাবলই চায়া আছে। কেনে চায়া থাকবু তাই কহো ..

কেমন ভয় পেয়েছিল বানসর।

বৃষ্টি নামছে আকাশ ভেঙে। কাঁচা ধান গাছের ক্ষেতের মতো কালো একটা বর্ষা থম থম করে আকাশে। বৃষ্টির কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যায় দূরের বাঁশঝাড়গুলো। ছেঁড়া মাদুর ভাঁজ করে এক পাশে বাঁশের কঞ্চি গুঁজে তিনকোনা মতো একটা শপলা তৈরি করে নিল বানসর। তা মাথায় দিয়ে বৃষ্টির ভেতরই হাল দেওয়া চলবে জমিতে। দূর থেকে মাঠের মধ্যে কর্মরত বানসরকে দেখায় একটা অতিকায় জলচর পাখির মতো।

উঁচু ডাঙায় খাটো দড়িতেঁ বাঁধা একটা গরু ঘাড় নিচু করে টান হয়ে বৃষ্টিতে ভেজে।

একটানা বৃষ্টি চলবে অনেকদিন। হঠাৎ কাজ থাকে না। দুটো চাষ-খাওয়া এঁটেল মাটির জমি পিছল আর শক্ত হয়ে থাকে জলের পাতলা চাদরের নিচে। এলোমেলো টাটকা ঘাসের মাথা খোচা খোঁচা হয়ে জেগে

থাকে সারা মাঠ। প্রথম বর্ষার ঘোলা জল থিতিয়ে গিয়ে শাদা হয়ে ক্রমশ টলটল করে ওঠে এক মাঠ পাতলা দুধের মতো।

বেশি জল হবার আগেই কাঁদরের নিচু জমিটা চষে ঠিক করে ফেলতে হবে। বীছন ধানের চারা তৈরী করার জন্যে উঁচু ডাঙার এক বিঘা জমি এখনই প্রস্তুত রাখতে হবে।

লোক্যাল বোর্ডের খালটানা কাদা-রাস্তায় দূর পথের গরুর গাড়ীর চাকা আটকে যায়।

ওই—ওধারে, ধরেন কেনে চাকাটা? গাড়োয়ান হাঁক দেয়।

জল-ভেজা ক্ষেত থেকে তামাক খেতে খেতে শপলা মাথায় বানসর উঠে আসে। পা থেকে একটা জোঁক ছাড়িয়ে ফেলে দেয়।

কোস থিকে আচ্চেন তে?

হরিপুর।

কাদার মধ্যে পা গেড়ে গরুর গাড়ীর চাকায় ঠেলা মারে। ঠেলা মারতে মারতে জিজ্ঞেস করে:

ওতি বর্ষা তো বেশ হৈল্?

হৈল্। ধান হইবে ষোল আনা।

হইবে।

ও-বাহা—বাহা—বাহা—

ধান হবে তাহলে। জল দেখে, মাটি দেখে হঠাৎ আশাতীত খুশি হয়ে উঠেছে সবাই। আধ হাত জলের নিচে নরম হয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে ভুরভুরে এঁটেল মাটি। দেখতে দেখতে লক্‌লকিয়ে বেড়ে উঠেছে হালকা পাতলা চারাগুলো। হাঁটু সমান উঁচু। কয়েকদিনের ভেতরই সারা মাঠে গেড়ে দেওয়া হবে, জলের ওপর কচি ডগাগুলো জেগে থাকবে কি থাকবে না।

বাহা—বাহা—বাহা—

মাদলের শব্দ উঠছে সারা গাঁ থেকে। দেবতাকে স্মরণ করে ধান গাড়ার শুভ কাজ আরম্ভ করতে হবে। গত বছরের, তার আগের বছরের, তার আগের বছরের—চিরকালকার দুর্দশার কথা হঠাৎ ভুলে গেছে সবাই। এক ঘরে সংকীর্তন শেষ হলে আর এক ঘরে আরম্ভ হয়। সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করে বসে মানুষ। কেননা ধান আছে ঘরে, কর্জা দিয়েছে জোতদার। টিপসই নিয়েছে; তা হোক, তবু দিয়েছে।

হইবে হইবে কাম শুরু করি দাও আর কি—

হাঁ হইবে, নিচ্চয়—পনের আনা—মর্যাদা বেড়ে গেছে বানসরের। শিবরাজপুরের মেয়েদের দিয়ে চিড়ে কুটিয়ে এনেছে বারো সের। নেমন্তন্ন করেছে কুটুমদের। আগামী ফসলের আশ্বাসে ময়ালীর কথা মনে পড়ছে এখন। আহা, অতো ছোটোতে বিয়ে দিয়ে দিতে হয়েছে খাটিয়ে বিটিটাকে। বেশি বয়সে বিয়ে দিলে পণ মিলত আটকুড়ি।

চিড়ে দিল, ছোলা দিল, নুন তেল দিল, পাকা লঙ্কা দিল কলার পাতে। তারপর গলায় গামছা দিয়ে জোড় হাত করে মিনতি করল—

হাঁ খাওয়া করো, গরীবের অন্ন।

ময়ালী আসিবার চাহছিল, নতুন কুটুম বলে, খাটিবার পারে ওমরা বিটি ছাওয়া—

আসিবার চাহছিল? ধানটা উঠুক, আচ্ছা, খাওয়া করো, কিছু মনে করিবেন না, ব্যস্ত হয়ে হাত-জোড় সবারই পাতের কাছে ঘুরে বেড়াতে লাগল বানসর।

হইবে নিচ্চয়, পনের আনা—

চালু জমিডার দক্ষিণ পাকে উঁচু করি আল বাঁধিবা নাগিবে।

সংকীর্তনওয়ালারা দাওয়ায় বসে অন্য গান ধরে—

ঐ যে, কাটাবাড়ীর হাট ভাঙিয়া

ও হাট নাগিল মধুবনা,

যাও সবাই মধুবনা

নাগিবে না খাজনা···

কি কহছে ? নাগিবে না খাজনা ?

না নাগিবে না খাজনা··

হঠাৎ সবাই হাসতে শুরু করে, অনেকক্ষণ ধরে নিঃশব্দ খুশিতে।

কহছে নাগিবে না খাজনা ?

কেরোসিন তেল নেই। নাড়া জ্বালিয়ে গান জমে সারারাত। উৎসাহে চাটি মারে খোলের চামড়ায়।

ঐ যে নাগিবে না খাজনা—

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে অশ্রান্ত। ময়নালীর কথা মনে পড়ছে এখন।

সকালে বাইরে এসে থমকে গেল সবাই।

একি চলি আচচে পানি।

হায়রে বাপ, কতো বিষ্টি !

মাঠের জল রাস্তা ছাপিয়ে ভেঙে পড়েছে। বান ডেকেছে কাঁদরে। ঢালু জমির অর্ধেকটা ঠেলে উঁচু হয়ে উঠেছে ঘোলা বুদ্বুদ। গুছিগুছি কচুরিপানা, ভেসে এসেছে কোথা থেকে।

কচুরিপানা ; সোত বয়েছে···

মুখ শুকিয়ে মাঠের শেষপ্রান্তে তাকাল সবাই। তিন ক্রোশ দূরে নাগর নদীর জল বাঁধ ভেঙে মাঠে ঢুকে পড়েছে হয়ত। না হলে কচুরিপানা এল কোথা থেকে ?

নামি যাবে পানি···

বিড়বিড় করে বানসর বললে, তারপর পাশের লোকগুলোর দিকে বোকার মতো তাকাল। সর্বনাশা বন্যা। নাগর নদীর বাঁধ ভাঙলে রক্ষা নাই।

দশ দিন ধরে ক্রমাগত বেড়ে উঠল জল। লোক্যাল বোর্ডের থালটানা সড়কটা বুক ভেঙে নুয়ে পড়েছে। গল্‌গল্‌ করে এক হাত উঁচু জলের তোড় ছুটেছে আশ্চর্য নিঃশব্দে। সাপের মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে গ্রাস করে ফেলছে সব—ডাঙা জমির মাথাটুকু ছাড়া।

আর জলের সঙ্গে সমান তালে বেড়ে উঠেছে কয়েকটা বুনো ঘাস। শান্তভাবে মাথা উঁচিয়ে আছে। পাতার ডগায় আঁকড়ে বিজ বিজ করছে বাসা-হারানো কালো মেঠো পিঁপড়ের সারি। মনে হবে না, কিন্তু জলের তলে এক-গলা লম্বা হয়ে গেছে ঘাসগুলো।

দশ দিন পরে জল নামতে শুরু করল। ডাঙা জমির চারপাশে ভেসে এসে থিতিয়ে রইল খড়কুটোর সীমানা। কিন্তু জলের তলে ধান গাছ সাপটে নিয়ে গেছে কোথায়।

কাঁদরের জল নামল না। জমে রইল বিলের মতো হয়ে, নিস্তব্ধ সর্বনাশের মতো!

মোড়ল-গাঁয়ের কয়েকটা ঘর ধ্বসে গিয়েছিল জলের সময়। বানসরের ঘরের হাঁ-করা দাওয়ার ভেতর থেকে একটা বুড়ো গোথরো খস্‌ খস্‌ করে সরে এল। রোদ্দুর উঠেছে চন্‌ চন্‌ করে। এঁকেবেঁকে সরে গিয়ে ঘুণ-ধরা বাঁশের খুঁটিটা শুঁকল খানিক তারপর একটা খোঁদলের ভেতর মাথাটা ঢুকিয়ে স্থির হয়ে রইল।

ঘরের দাওয়ায় বসে নিঃশব্দে তাকায় বানসর। জোতদারের লোক এল

তারপর। যাদের জমিতে এ বছর আর চাষ হবার আশা নাই, তাদের ঘরে এক-এক করে এসে হাঁক দিল।

গরু কইরে বাপু তোর ?

নেংটি-পরা লোকগুলো আতঙ্কিত হয়ে চীৎকার করল এলোপাথাড়ি।

গরুগুলি নিছেন কেনে, চাষ করমু ?

চাষ হইবে না, বাপু কর্জা খাছো, শোধ দিবু কি দিয়া ?

কেনে নি হইবে ? যাউক এ বৎসরডা ? আবার তো হইবে ?

টিপসহি দিছো, মালুম ছে ?

জোতদারের—গোমস্তা পুবনো টিপসইওয়ালা কাগজ বার করে দেখিয়েছে আর বিহারী দারোয়ান পেতলে বাঁধানো লাঠি হাতে করে এগিয়ে এসেছে। তাই আর কিছু বলে নি।

শিবরাজপুরের লোক দুটো কপালে চাপড় মারতে লাগল আফসোসে—কি ভেবে গোমস্তার পিছু পিছু হেঁটে গেল পাগলের মতো। পাগলের মতো বানসরও চলল পিছু পিছু। আবো যাদের গরু খুলে নিয়ে গেছে তারাও চলল পিছু পিছু। জোতদারের খালানে খোলা জায়গায় দড়ি দিয়ে বেঁধে বাখা হল গরুগুলোকে। তিন ক্রোশ পথ হেঁটে এসে বানসর আর শিবরাজপুরের লোক দুটো আর আরো অনেক লোক বসে রইল তাদের নিজেদেব গরুগুলোর সামনে। নিঃশব্দে কাদামাখা হাত দিয়ে কপাল চাপড়ালে কয়েকবাব। গরুগুলো আর পাওয়া যাবে না জ্ঞানে তবু ফিরে এল না তারা।

আর জোতদারের বাড়ীতে অনেক লোক খাটে। নিচু জমি বানে ভেঙে গেলেও উঁচু জমিতে দ্বিগুণ ফসল তুলবে জোতদার। সন্ধ্যাবেলা ধান গেড়ে গেড়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেছে ; ওদের দেখে কিন্তু অবাক হয় না, কথা বলে না। পাতা পেড়ে ভাত খায় তারা নিঃশব্দে। তারপর

খুঁটিতে ঠেস দিয়ে তামাক খায় আর পাটের দড়ি পাকাতে বসে ক্লান্তভাবে। জোতদার টাকা মজুরি দিয়েছে; সে টাকা শুধতে হবে খেটে খেটে। রাত এক পহর পর্যন্ত খাটবে ওরা কিন্তু কোন কথা বলবে না। অনেক আগে জমি গরু হারিয়েছে ওরা—বুকের ভেতরটা কেমন হিম হয়ে আসে বানসরের।

হঠাৎ বিড় বিড় করে কি বকতে শুরু করে বানসর। শিবরাজপুরের লোকটা বিবর্ণ গলায় জিজ্ঞেস করে—কি ?

গুঁই গুঁই করে বানসর উত্তর দেয়—ময়ালী আসবার চাহছিল আমার কাছে, কাঁদাকাটি করছে··

ময়ালী ?

কাল যামু কুটুমবাড়ী। ময়ালী আসবার চাহছিল—ছোট বয়সে বিভা দিছি—

ছোট পুঁটলীটা ময়ালী নিয়েছে বাঁ হাতে। ডান হাতে হাঁটু-ঢাকা খাটো কাপড়ের খুঁটটা আরো তুলে বানসরের পিছু পিছু হেঁটে আসছে কাদা-রাস্তায়। বিয়েতে পাওয়া ভরণের মল জোড়া কাদায় ঢেকে গেছে।

ধু-ধু-করা মোড়ল-গাঁকে ছাড়িয়ে আরো উত্তরে চলছে ওরা। ময়ালী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে—

কুন ঠাঁই যাছো গে ? বাড়ী ছাড়ি আসিনু ? উত্তর না দিয়ে জোরে জোরে হাঁটে বানসর। অনেক দূরে গিয়ে গাছতলায় বসল বিশ্রাম নিতে। বিচিত্রভাবে তাকাল চারদিকে।

পোড়া দেশ ইটা। উত্তুর দেশ তো জমি সস্তা। আবার তো হইবে ধান ?

ময়ালী বোঝে না, পোষা জন্তুর মতো বাপের মুখের দিকে চেয়ে থাকে শুধু।

হৃষ্টপুষ্ট মেয়ে ময়ালী। খাটতে পারে যোয়ান বৌয়ের মতো। উত্তর দেশের অপরিচিত লোকদের সঙ্গে আবার লুকিয়ে কথাবার্তা ঠিক করে নেবে বানসর। আটকুড়ি টাকা পণ নেবে। গরু কিনবে। আর সেখানে অনেক জমি সস্তায় বন্দোবস্ত করা চলবে বৈকি। খোঁজ পেলে কুটুমেরা ডাং নিয়ে তেড়ে আসবে হয়ত ; তবু…

আবার তো হইবে‥ বানসর স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে বলে।

তেরশ পঞ্চাশ গেল। ধানকাটার সময় লোক পাওয়া যায় নি। এমন কি পশ্চিম থেকে—পূর্ণিয়া কাটিহার থেকেও লোক এল না। দেশের চারদিকে রাস্তাঘাট হচ্ছে, ফৌজে কুলী খেটে মজুরি মিলছে ছাপান নোটে—তাই টান পড়ল লোকের। একান্ন সালও গেল। কিন্তু তৃতীয় বছরে, ধানকাটার সময় লোক পাওয়া গেল আবার। সৈন্যদের জন্যে রাস্তা তৈরীর প্রয়োজন এখন নেই আর। এরোড্রোমের জমিতে কুলীর দরকার নেই। আসামের জঙ্গল থেকে লড়াই-খালাস মজুররা ফিরে এসেছে ম্যালেরিয়া নিয়ে।

ধানকাটার সময় বড়ো বড়ো জোতদারদের খালানে এসে জুটল বিহারী ক্ষেত-মজুররা। কুটোকাটা জড়ো করে আগুন জ্বালাল শীত এড়াতে। গাছের তলে রান্না করে খেয়ে দেয়ে কালিপড়া মাটির হাঁড়িপাতিল বেঁধে রাখল আমগাছের ডালে।

আর কাজ পেল সবাই—ধানকাটার কাজ।

বিহারী লোকজনের সঙ্গে কোথা থেকে ফিরে এল আঁধারু উত্তর বঙ্গে তার

এই নিজের জেলাতেই। একটা ছেঁড়া ঝুলিঝুলি কোট গায়ে দিয়েছে ও; গায়ের আন্দাজে কোটটা বড়ো—পিঠ আর ঘাড়ের জায়গাটা ছিঁড়ে গিয়ে আরো খানিকটা বড়ো দেখাচ্ছে। কোটের নিচে ময়লা চাদর গায়ে জড়ানো; তারই একটা ভাঁজ তল থেকে তুলে এনে কান আর মাথা ঢেকেছে! যে কাপড়টুকু নেংটি করে পরেছে তা কোটের লম্বা ঝুল পেরিয়ে উরুর নিচে নামেনি। শীতে আর ধুলোয় হাতে পায়ে একটা ফাটা ফাটা ভাব এসেছে, গায়ের স্বাভাবিক বাদামী রঙটা মিশ কালো হয়ে এসেছে ঠাণ্ডা হাওয়ায়।

উত্তর বঙ্গের 'পোলিয়া' জাতের মানুষ। সাঁওতাল নয়, তা বোঝা যাবে শুধু ওর অপরিচ্ছন্ন বেশভূষায়; বাঁকাভাবে বসান লম্বা ধাঁচের চোখ আব ঠোটের ওপর পাঁশুটে রঙের অল্প একটু মোচ দেখে।

ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ডেব রাস্তা মেরামত করার কাজে জনচারেক বুড়ো যোয়ান বিহারী মজুব যোগাড় করা গেছে বহু কষ্টে। আরো লোক চাই। তাই বেশী করেই মজুরি কবুল করেন ঠিকাদারবাবু। একহাতে সাইকেল আর একহাতে আঁধারুকে চেপে ধরে টেনে নিয়ে এলেন হাফপ্যাণ্ট পরা ভদ্রলোকটি—

নে, খেটে দে; কোদাল চালিয়ে হাট পর্যন্ত এই রাস্তাটা ঠিক করে দে বাপু।

আঁধারু তবু দাঁড়িয়ে থাকে। সারারাত গাছতলায় পড়ে থেকে শীত করেছে বলে এখনো অমনি কাঠের মতো অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, না আদপে লোকটা জরদ্গব বোঝা যায় না।

কি, খাটবি কি খাটবি না—সাইকেল হাতে করে ঠিকাদারবাবু মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করেন।

কেনে খাটিম না? তবে কতো দিবেন সেইটা কহে দাও—

পিঠের ওপর লাঠিতে বাঁধা লম্বাটে পোঁটলাটা নাড়িয়ে আঁধারু একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়ায়।

ঐ ঐ এক্‌টাকা। কজন হলি পাঁচজন? রাস্তাটা আধাআধি শেষ করে ফেলতে হবে কিন্তু। সন্ধ্যেবেলা এসে মিটিয়ে দেব—

কাজ শুরু করবার আগে অন্য চারজন বিহারী মজুর অলস হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার প্রতিবাদ করল।

নাই হোবে বাবু—অতোখানি রাস্তা ঠিক নাই হোবে—

হবে, হবে—ঠিকাদারবাবু সাইকেলে চেপে চলে যান।

লাঠির ডগায় বাঁধা পোঁটলাটা থেকে আঁধারু একটা কোদাল বার করে। ছেঁড়া কোটটা খুলে নেয়।

হবে তো লাগাও—অসন্তুষ্টভাবে বিড়বিড় করে বকতে বকতে ঠিক হয়ে নেয় অন্য কয়েকজনও।

তারপর কোদাল চালায় ঝপ ঝপ্ করে, মাটি তুলে দেয় রাস্তায়। কেন না পুরো একটাকা করে মজুরি কম নয়।

ডিস্ট্রিক্‌ট্ বোর্ডের রাস্তাটা সোজা চলে গেছে সেতাবগঞ্জের ঘাটে।

দু পাশে শুয়ে-পড়া পাকা ধানক্ষেতের ওপর রোদ্দুর পড়েছে। শালিখ আর চড়ুই পাখির ঝাঁক তার ভেতর ঠোকর মারছে লাফিয়ে লাফিয়ে। সরষে ক্ষেতে শুকিয়ে এসেছে হল্‌দে ফুলগুলো। খেঁসারী কলাইয়ের শুকনো ঝাড় আলগা বাতাসে খস্ খস্ করে নড়ে উঠছে। চারদিককার খানিকটা মেটে বাদামী শুকনো আবহাওয়ায় তামাকের চারাগুলো হঠাৎ বড়ো বেশি সবুজ দেখায়।

মনের ভেতর একটা শক্ত জায়গা উঁচু হয়ে ওঠে। কোদাল চালানো থামিয়ে গল্প করতে ইচ্ছে করে।

আনিয়াগঞ্জ থানার দিকে ধানী জমিতে আখচাষ দেয় মানুষ; বলে, ধান গাড়লে পেটে খাবো; আখ দিলে পয়সা আসবে—আঁধারু ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে বলে।

আধবুড়ো শক্ত চেহারার বিহারী মানুষটা অন্য কথা ভাবে: লড়াই শেষ হল তো বহুৎ মানুষ ফিরছে ঘরে। ভাবছে, কি ধানকাটার জন্যে লোক লাগবে তো এক-এক করে এদিকে এসে যাচ্ছে সবাই।

আনিয়াগঞ্জ থানার ছুই নম্বর রিউনিয়ন তুগ্‌গাপুর; ওতি হামার বাড়ী— আঁধারু বলে।

হাটের পথে খালি গরুর গাড়ীগুলো সারি বেঁধে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। পাতলা শাদা ধুলো উড়ে উড়ে গিয়ে জমছে দু পাশের আসাম লতার গায়ে। ধুলো খেয়ে খেয়ে পাতা-ঝোপের ওপরটা পাঁশুটে হয়ে গেছে, তলের দিকটা এখনও মেটে সবুজ। বেঁটে বেঁটে ঘোড়ায় চেপে মাঝে মাঝে খালি বস্তা বেঁধে নিয়ে লাল সবুজ আলোয়ান গায়ে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে পাইকাররা। একটা নেউল তুর তুর করে রাস্তা থেকে নেমে ছুটে পালাল। কাঁচা পাতায় তামাক মুড়ে আগুন ধরিয়ে বিহারী লোকটা কড়া ধোঁয়া টানে।

আঁধারু বললে—তুটো ধান কাটা হয়ে গেল তো এই আর একটা ধান-কাটা এল।

প্রায় একই রকম চিন্তা সবারই। আধ বুড়ো লোকটা বলে—আমার এক লড়কা! দেশে ফিরতে বড়ো নারাজ। বলে, যেখানে কাজ সেখানে যাবো; নয়ত আখকলে কাজ নেবো।

আঁধারু বিষণ্নভাবে জিজ্ঞেস করে—দেশে জমি আছে তোমার?

চট করে উত্তর দেয় না আধবুড়ো লোকটা। কড়া ধোঁয়া টেনে টেনে গলার শিরা ফুলে ওঠে। বার কতক থুথু ফেলে অন্য দিকে তাকায়। তারপর বলে—না, জমি নেই। কিন্তু একটা নিয়ম আছে কি জমিদারের ক্ষেতে খাটলে ফসলের একটা ভাগ পাওয়া যায়। তো সেটাও জমি চাষ করাই তো হল?

তারপর আর গল্প করতে ইচ্ছা করে না। অকারণে ভার হয়ে আসে বুকের ভেতরটা। পরিশ্রম করলে এই যন্ত্রণা-বোধটা টের পাওয়া যাবে না।

কোদাল চালাতে চালাতে এক সময় কোমরে হাত দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়ায় আঁধারু—এই কোদাল চালাও, এর খাটুনিটা একরকম। আবার ধান কাটো, তো সে খাটুনিটা অন্য রকম!

অন্যরকম—

নিজের মধ্যে ডুবে থেকে সায় দেয় লোকটা।

বিকেল বেলা হাফপ্যাণ্ট পরা লোকটা এল। মাটি চাপান রাস্তাটা দেখে সন্তুষ্ট হয় নি, এই ভাবটা প্রকাশ করার চেষ্টা করল নানারকমে। তারপর পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বললে—কালকে এর চেয়েও ভাল করে কাজ করতে হবে।

কিন্তু পরের দিন সকালে ছেঁড়া কোটটা গা থেকে খুলল না আঁধারু। চেপ্‌টা পুঁটলিটায় কোদালটা ঢুকিয়ে নিয়ে লাঠি সমেত ঘাড়ে কবে হাঁটতে শুরু করল রাস্তা দিয়ে।

ওই কোথায় যাও বাবে?

না, খাটবে না ও।

কিন্তু মজুরিটা খানিক বেশি ছিল কি ছিল না?

থাকুক—হঠাৎ ঝগড়া করার ঝোঁক আসে আঁধারুর। রাস্তার ওপর ফিরে দাঁড়িয়ে হাত টান করে চীৎকাব কবে—মানুষটা কহছে কি খাটি যাও বারে। না খাটিম। পণ্টনে কেমন মাটি কাটিনু কি না কাটিনু সেইটা কহো। তো ফিরি আসিনু কেনে সেইটা কহো—

আধবুড়ো লোকটা ঝগড়া করে না। কেমন একটু ঈর্ষাভরা চোখে তাকিয়ে থাকে; কিন্তু কি করবে আঁধারু সেইটা বলে যাক?

কেনে, ধান কাটিম্ !

মাটি কাটার চেয়ে ধান কাটতে ভাল লাগবে। ভোর রাতের শীতে ছেঁড়া কাঁথা জড়িয়ে হিমে ভেজা ধানের গোছায় হাত দিয়ে অস্পষ্ট সুখ পাওয়া যাবে। আর তা শীতের জন্যে নয়—অন্য কি একটা আশ্চর্য স্পর্শের জন্যে। যে জমির সব ধান কাটা হয়নি এখনও সেখানে দাঁড়ায় আঁধারু। চওড়া নিচু কাদরের পাড় থেকে লোভীর মত তাকায়—ধান তো এলায় কাটিবা বাকি আছে ?

আছে—ধান কাটতে কাটতেই নিচু হয়ে জমির মালিক উত্তর দেয়।

ঘাড় থেকে লাঠিতে বাঁধা লম্বাটে পোঁটলাটা নামিয়ে রেখে লোভীর মতো নিঃশব্দে হাসে আঁধারু—ধান কাটার জন্যে একটা দুটো লোক তাহলে দরকার হতে পাবে ?

লোকটার মুখ কঠিন হয়ে আসে—কালী জোতদারের সাত বিঘে জমি ‘আধি’ করছি আমি। তো খাওয়া-পবা দিয়ে একটা মানুষ রাখলে আমার খালানে ক-বিশ ধান উঠিবে ?

কিন্তু ধরো এতো বড় গাঁ—তো কোন লোক বুড়ো হয়ে গেছে, কি অসুখে পড়েছে, কি একলা সমস্ত ধান কেটে তুলতে পারবে না—অনেক জমি আছে তার—তেমন কোন লোকের তো দুটো চারটে পাইট দরকার হতে পারে ?

আধিয়ারটার চোখ হঠাৎ নরম হয়ে আসে। বিলাপের মতো করে বলে—হামার গাঁওত্ নাই। হামার গাঁওত্ তেমন চাষী নাই একটাও।

না, এ গাঁয়ে কাজ মিলবে না। তবু ভাল লাগে। তামাকের ক্ষেত থেকে এক দলা মাটি তুলে নিয়ে আঁধারু পরখ করে ঝানু চাষীর মতো। তামাকের চারাগুলো লক্ষ্য করে উঁচু হয়ে বসে: তেমন তাজা হয়নি। সারি সারি চারার মাঝে আলগা চাষ দিতে হয়েছে নতুন করে।

এই মাঘ মাসে একটা বৃষ্টি হলে এতদিন এতটা বড়ো হয়ে যেত চারা গুলো।

গোড়ালির ওপর হাত দিয়ে কতখানি উঁচু হতে পারত বোঝায়।

ঘাড় বেঁকিয়ে হুঁকো টানতে টানতে ক্ষেতের মালিক সায় দেয়—উঠত!

আলগা চাষের মাটিটা আঙুল দিয়ে নাড়ে আঁধারু—এই চাষটা দেয়া যায় তো গাছ ঠিক হয়া যাবে এবার—

মাঘ মাসে এখনও বৃষ্টি হল না! অস্পষ্ট আশঙ্কায় মন্তব্য করে মানুষটা। অদ্ভুত ভাল সেই আশঙ্কা। সারা বছর ধরে একটা মৃদু মাটি রং স্বপ্ন। আমন উঠে গেলে রবিশস্য। 'ভাদই' উঠে গেলে পাট। প্যাট উঠে গেলে সরষে—প্রত্যেকটি ফসলে ছড়িয়ে আছে নতুন ফোটা অঙ্কুরের মতো প্রত্যাশিত বিস্ময়।

পোটলাটা ঘাড়ে করে আবার উঠে দাঁড়ায় আঁধারু, তবু চলে যেতে পারে না। নিকোনো তকৃতকে খালানে মরাই বাধা হয়েছে। উঁচু উঁচু মরাইয়ের ওপর, শীষ সমেত পাকা ধান সাজিয়ে দেয়া হয়েছে মুকুটের মতো। নোলক-পরা, বুকে কাপড় জড়ানো চাষী-বৌ ধানের গোছা আছাড় মেরে মেরে ঝাড়াই করছে। গুঁড়ো গুঁড়ো খড় উড়ে পড়েছে তার সারা গায়ে।

কিন্তু মেয়েটিকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে না।

তোমার খামারেই থাকি আজ রাতটা?

ভাল কথা।

সন্ধ্যেবেলা ধানকাটার শেষে পেট পুরে খেতে হবে। মোটা মোটা লাল লাল ভাত মটর শাকের ঝোলের সঙ্গে দলা পাকিয়ে খেয়ে তৃপ্ত দেখায় সবাইকে। তাই খালানে এসে কাঁথা জড়িয়ে বসে। পাটশলা পুড়িয়ে আগুন জ্বালায়। হাত পা সেঁকে, আর গল্প করে।

দুর থেকে আরও একটা গাঁয়ের মাদলের শব্দ ভেসে আসে, সাঁওতালী মাদল।

খুব নাচগান লাগিয়েছে ওরা—

কালী জোতদার খবর পেয়ে গিয়েছিল। তো ওরা তীর-ধনুক নিয়ে ধান আগলে বসে রইল। ফিরে এসেছে কালী জোতদার—কিছু বলে নি—

ওই গাঁয়ের সাঁওতাল আধিয়াররা ধান কেটে নিজেদের খালানে তুলেছে; জোতদারকে সাফ বলে দিয়েছে যে ধান ওরা নিজেরাই ভাগ করবে। সুদ দেবে না, আবোয়াব দেবে না—তারই গল্প। অমনি সাহস আর খানিকটা বোকামি যাদের নেই, তারা মুগ্ধ হয়ে শোনে।

কালী জোতদার ছাড়বে না। থানা পুলিশ করবে। সে নাকি দেখেছে, কালী জোতদার কোটের বোতাম লাগিয়ে নতুন কেনা লাল-শাদা টাট্টু ঘোড়াটায় চেপে থানা বলে রওনা দিয়েছে—

সারা বছর ধবে ধান গাছ বড় করে তুলে, সেই ধান ফলানোর গল্প। নতুন জ্বালানি চাপিয়ে ফুঁ দেয় আগুনে; লাল আভায় চিক্ চিক্ করে চোখ।

সাঁওতালরা বিষ মাখিয়ে রেখেছে তীরের ফলায়—

কি ভেবে আঁধারু জিজ্ঞেস করে—আইনটা তাহলে কার পক্ষে?

জোতদারের পক্ষে। মোকদ্দমায় ডিক্রী হবে ওর। কিন্তু সাঁওতালরা তবু বলে, ধান দিব কেনে!

কে একজন কীর্তনের গান ধরে। অন্য সবাই চুপ করে যায়। চুপ করেও কিন্তু ভাবে ধান কেটে তোলার কথাই। ইংরেজী জানা উকিল আমলারা যে সব গোপন শক্তির কথা জানে—সেই আইনের কথা।

অনেকক্ষণ গানের পর একজন বুড়ো চাষী বিষণ্ণভাবে মাথা ঝাঁকায়—গোটা গাঁকেই উচ্ছেদ করবে কালী জোতদার। নতুন লোককে আধি দেবে—

ঘুম আসে না। বিচালি বিছিয়ে খালানে শুয়ে রইল আঁধারু। ধান ক্ষেতে আর নিচু জায়গায় ভিজে কাপড়ের মতো পুরু কুয়াশা জমছে।
সকালবেলা উঠে আঁধারু চলে যাবে অন্য জায়গায় কাজের সন্ধানে। অন্য লোকেরা যাবে ধান কাটতে। আগুন জ্বালিয়ে নেংটি-পরা মানুষ গুলো রাত আরও একটু ফর্সা হওয়ার অপেক্ষা করে।
আমার পাঁচ বিঘা জমি ছিল, তো বিচে দিলাম। অকালে দুটো ছাওয়াল মরে গেল, তো বিচে দিলাম—আঁধারু উৎসুকভাবে জানাল, কেউ উত্তর দিল না।
বিচি ফেলালে জমি ফিরিবা নয়? উৎসুকভাবে প্রশ্ন করে আঁধারু। যা জিজ্ঞেস করেছে তা ছাড়াও হয়তো, আরো কি জানতে চায়।
ফিরিবা নয়—বিষণ্ণভাবে উত্তর দেয় বুড়ো চাষীটা।

এক টুকরো জমি। সারা বছর খেটে তাতে ফসল ফলানো। সেই ফসল রক্ষা করার জন্যে রক্তাক্ত লড়াই—একটা ঝাপসা স্বপ্ন আবৃত করে ফেলেছে আঁধারুকে। অসুস্থের মত ধান কাটার কাজ খুঁজে বেড়ায় গাঁ-ছাড়া মানুষটা।
ধান তো এলায় কাটিবা বাকি আছে?
পনের বিশটে মৌজে পেরিয়ে একটা গাঁয়ে ধান কাটা হয়নি এখনও। ক্ষেতে ক্ষেতে শুয়ে আছে পাকা সোনা হলুদ ধান। গরু বাছুর পায়ে মাড়িয়ে নষ্ট করে দিচ্ছে।
আছে না? আগত্ কাটিবা দিছে জমিদার? লম্বা পাকানো চেহারা একজন বুড়ো চাষী পাল্টা প্রশ্ন করল আঁধারুকে।
তাই সেখানে থেকে গেল আঁধারু। ধান কাটল ভোর রাত্রি থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত। ছোট ছোট ন্যাংটা ছেলেরা থালায় করে ভাত নিয়ে এল মাঠে।

মেয়েরা কাটা ধানগাছের শীষ মাথায় বয়ে নিয়ে গেল খামারে। দুপুরে বাঁশের কঞ্চি পুতে ছেঁড়া কাপড় টাঙিয়ে সেই ছায়ায় শুইয়ে রেখে দিল কোলের ছেলেদের।

অস্পষ্টভাবে মাথা ঝিম ঝিম করে আঁধারুর। ধান কাটতে কাটতে কেমন একটা গোঁ এসে গেছে ওর—নিহত খরগোসের বুক আঁচড়ে রক্ত খাওয়া শুরু করলে খটাসের সমস্ত শরীর যেমন টান টান হয়ে ওঠে তেমনি। শক্ত দুই পা ফাঁক করে নিচু হয়ে আলগা ধানের গোছা টেনে ধরেছে বাঁ হাতে—ঘষা লেগে গরম হয়ে উঠছে কাস্তে।

ছ বিশ ধান পাকা !

ছ-বিশ !

সন্ধ্যেবেলা আগুন জ্বালিয়ে গান গল্প। আঁধারু বলে—আনিয়াগঞ্জ থানার দুই নম্বর রিউনিয়ন দুগ্গাপুর—উতি আমার বাড়ী।

থালায় করে পান সুপুরি আর চুন নিয়ে আসে মণ্ডলের বেটার বৌ। বাঁশের ছোট চৌকিটা টেনে রসিকতা করে আঁধারুর সঙ্গে—খাটে বসি খাও ভাত ! রসিকতা করে হাসে আর সারাদিন খাটুনির পর ক্লান্ত দেখায় না চাষী বৌ-কে !

গল্প করতে করতে আঁধারু বলে—আমার কাছে দু কুড়ি তিন কুড়ি টাকা আছে। তা সেতাবগঞ্জ হাটে গরু বিক্রী হয় কি দরে ?

সাত কুড়ি আট কুড়ি।

কি রকম নিভে যায় আঁধারু, কথা বলে না। অন্যেরা গল্প করে।

এখন তো ধান কাটা হয়ে যাচ্ছে ; চাষীরা বলবে যাই গরু কিনি এক জোড়া ; গিরস্তি করতে হবে না ?

তো গরুর দাম সাত কুড়ি, আট কুড়ি। পশ্চিমা গরু, চাই দেশী গরু। ধানের দর নামি গিছে ?

নামি গিছে তো চাষী মরিল্; উঠবি তো খাবি জোতদার!

তো চাষী মরিল্! দু দিকেই চাষী মরিল্!

গল্প শেষ করে শুয়ে পড়ে দু-চারজন। পাটকাটির আগুন পুড়ে যায় ঝপ্-ঝপ্ করে। শাদা হালকা ছাই উড়ে যায় ঠাণ্ডা হাওয়ায়।

শোবার আগে একটু ইতস্তত করে আবার জিজ্ঞেস করে আঁধারু—কিন্তু সস্তা হতে পারে? এই হাট তার আগের হাটেই গিয়েছিল লোকটা। এই হাটে হয়ত সস্তা হতে পারে।

কি?

কহছি কি হালের গরু। সস্তা হবার পারে?

সস্তা হবার নয়, শক্তভাবে মাথা ঝাঁকায় লোকটা।

বিচালির ভেতর খুঁশে খুঁশে শুয়ে থেকে ঘুম আসে না। একটা 'ধোকর' গায়ে দিয়ে হঠাৎ একতরফা বকতে শুরু করে আঁধারু—পাঁচ বিঘা জমি আছিল্ হামার। পালি আসিনু কিন্তু জমিটা বিচি নাই। কেনে? না জমি বিচি ফেলাও তো ফিরৎ নাই। তাই বন্ধক থুছি জমি। এলায় তো ফির গিরস্তি করা নাগিবে...

মিথ্যে বকে চলে আঁধারু আপন মনে।

সপ্তাহখানেক ধরে ধান কেটেছে ও। মুখের ওপর থেকে দিনমজুরের স্বাভাবিক খড়ি খড়ি ভাবটা কেটে গিয়ে কেমন একটা শেওলার মত মসৃণতা এসেছে। বাঁকাভাবে বসানো চোখ দুটোতে ধানের কোণের মতো একটা স্বপ্ন শক্ত হয়ে উঠেছে কেমনধারা।

আমার পাওনা মিটিয়ে দাও—গোঁয়ারের মতো তাকিয়ে থেকে আঁধারু বললে হঠাৎ।

কিন্তু ধান ঝাড়াই হল না, মাড়াই হল না, এখন চলে গেলে চলবে কেন?

ধান দিয়ে দাও, নয়তো টাকা মিটিয়ে দাও, ঝোঁক ধরল আঁধারু, কেনে, হামার গিরস্তি করা নাগে কি না নাগে? দু বছর রাস্তা কাটিনু কি না কাটিনু? তো ফিরি আসিনু কেনে সেইটা কহো—

অবুঝ লোকটা তার পাওনা ধান যা পারল আদায় করে বেচে দিয়ে গেল জোতদারের গোলায়। নিজের তৈরী মিথ্যাকেই কখন বিশ্বাস করে ফেলেছে।

কুন ঠাইঁ—যাছো বা'রে?

পিঠে ছেলে বেঁধে ইউনিয়ন বোর্ডের ভাঙা রাস্তায় দাঁড়িয়ে চাষী বৌটা ডাকল আঁধারুকে। মুখে তেল মেখেছে, ক্ষারে-কাচা কাপড় পরেছে। হাটে বেগুন বেচতে যেতে মেয়েটা অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছে আঁধারুকে দেখে।

চলি যাছেন কেনে?

অস্পষ্টভাবে খুশি হয়ে ওঠে আধারু। কৈফিয়ৎ দেবার মতো করে বলে, হার্‌য়ামার্‌য়া চারো পাক দেখি ঠিক করিনু কি গরু এলায় কিনিম্ না!

অবাক হয়ে মেয়েটা তবু জিজ্ঞেস করে—যাছেন কেনে?

লাল ফুল ফুটেছে একটা শিমুল গাছে। তার তলে একটু বসল ওরা দুজন। আঁধারু গল্প করলে একতরফা—

পাঁচ বিঘে জমি। জোতদারের হাতে পায়ে ধরে আধি নেবে আরো দশ বিঘা। সাড়ে তিন কুড়ি টাকা আছে আরো চার কুড়ি টাকা ধার নেবে মহাজনের কাছ থেকে। ভাঙা বাড়ীটা সারাবে। এ বছর যেমন তেমন একজোড়া গরু কিনবে টাকা ধার করে। তারপর ফসল উঠলে শোধ দিয়ে দেবে সমস্ত। অবিশ্যি জোতদার বলবে, দুনো সুদ দাও। কিন্তু ও দেবে না। কেননা, পাঁচগণির সাঁওতালরা কি করেছিল? তীরে বিষ মাখিয়ে রাখেনি তারা?

মেয়েটা উঠে কোলের ছেলেটাকে পিঠে বেঁধে নেয় আবার। বেগুনের ঝুড়িটা তুলে নেয় কোমরে। আর অবাক হয়ে বলে—তা যাছেন কেনে ?

রাত হয়ে গেলে নিজের গাঁয়ে পৌছল আঁধারু। গাঁয়ের প্রথমে দু ঘর সাঁওতালদের বস্তি। তিন বছর আগে যেমন ছিল অনেকটা তেমনি। একটা কুকুর বেরিয়ে এসে আড়ষ্ট গলায় ডাকতে শুরু করল। সাঁওতালদের বস্তি পেরিয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে পোয়াটেক রাস্তা পেরিয়ে ওর গাঁ দুর্গাপুর। শিশির-ভেজা সদ্য ধানকাটা মাঠের গন্ধ টের পাবে আঁধারু। চাষ দেওয়া মাটির ভিজে স্পর্শ। কড়া-পড়া পায়ের তলে ধান গাছের গোড়া ঠেকছে মুড় মুড় করে।
কিন্তু কি হয়েছে। অন্ধকারে মাঠের ভেতর বসে পড়ে হাত দিয়ে মাটি পরখ করল আঁধারু। শক্ত হয়ে রয়েছে মাটি, বুনো ঘাস গজিয়েছে উঁচু নিচু হয়ে। পতিত থাকার মতো জমি তো এ নয় ?
দূর থেকে সাঁওতালদের কুকুরটার ডাক থেকে থেকে ভেসে আসছে। হঠাৎ সমস্ত আবহাওয়াটা কেমন ভয়ংকর বলে মনে হয়। অন্ধকারে সামনে একটা কালো আকৃতি উঁচু হয়ে আছে আবছাভাবে। যে দিকে হাঁটছিল সে দিকে না গিয়ে উল্টো মুখে গিয়ে উঠল একটা পরিচিত বাড়ীতে—মুলারাম মণ্ডলের বাড়ী।
ছেঁড়া কাপড় পরা আগন্তুক লোকটাকে মুলারাম চিনল একটু দেরী করে। বসতে বললে। ঘাড়ের পুঁটলিটা নামিয়ে আগুনের সামনে উঁচু হয়ে বসল আঁধারু। বসে থেকে অনেকক্ষণ পরে বললে—ধানী-জমি ডাঙা হয়ে আছে ও পারে !
আছে।

দশ হাজার বিঘা জমি। বস্থু জোতদার কিনে নিয়েছে গত আকালের সময়। ধানকল বসেছে।

হামার জমিডাও ?

তোমার জমিডাও !

তেমন অবাক দেখাল না আঁধারুকে। ছেঁড়া কোটের তল থেকে একতাড়া ময়লা ভাঁজ করা নোট বার করে কাঁপা হাতে গুনছে ও, আর তাকিয়ে আছে সেই অদ্ভুত মিট্‌মিটে চোখে—

এমন তো হতে পারে যে ইংরেজী জানা উকিল আমলারা কোন ফন্দি খুঁজে পাবে আইনের বইতে। আমার কাছে চার কুড়ি টাকা আছে; জমিটা ফিরে পাওয়া যাবে হয়ত ?

কয়েকটা লোক রাস্তা খুঁড়ছে, কয়েকটা পশ্চিমা মজুর। হাফ্‌প্যান্ট পরা ঠিকাদারবাবুকে মিনতি করল আধবুড়ো লোকটা—ইটা বাবু হামার মামুলী লোক আছে—

আঁধারুকে চিনতে পারে না ঠিকাদারবাবু। ধানকাটা শেষ হয়ে গেল, এখন তো লোকগুলো আসবেই এ দিকে। না খাটলে লোকগুলোর যে খাবার নাই—

জানোয়ারের মতো চোখে আঁধারু কুঁজো হয়ে তাকিয়ে থাকে ঠিকাদার বাবুর দিকে। আধবুড়ো লোকটা আঁধারুর হয়ে আবার মিনতি করে—ইটা হামার মামুলী লোক আছে।

তাহলে থাক। কিন্তু দশ আনার বেশী মজুরি নয়। রাজী ?

উত্তরে শুধু চাপা বাঁকা একটা শব্দ বেরুল আঁধারুর গলা দিয়ে।

কার যেন খেয়াল হয়েছে কবরের ওপর তিনটে নিশান পুতে দিতে হবে। কাগজের নিশান হলেও চলবে। একটা লোক উঠে গেল তারই যোগাড় করতে। যারা রইল তারা হঠাৎ কেমন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনায় মুখ চোখ বসে গেছে মানুষগুলোর। ময়লা আর রোদ্দুরের খড়ি উড়ছে গা দিয়ে। নতুন খোঁড়া কবরের মাটি থেকে একটা কাঁচা গন্ধ হাওয়ার টানে ভেসে আসে মাঝে মাঝে। গাছপালার ফাঁকে ঝিলমিল করে ফাল্গুনের কড়া রোদ্দুর।

বসে থেকে থেকে হঠাৎ ক্লান্তভাবে কে চীৎকার করল—হিন্দু-মুসলিম একসাথ!

ভেতরকার দুর্বোধ্য একটা আবেগ যে কোন পথে বেরোতে চায়।

একসাথ! ছাড়া-ছাড়াভাবে নিরুত্তাপ গলায় দূর থেকে সায় দিল একজন। হঠাৎ কেমন নিঃসঙ্গ শোনায় তার কণ্ঠস্বর। কেমন থম থম

করে চারদিক। সময়টা দীর্ঘ হয়ে ওঠে। ভাল লাগছে না বলে দু-একজন আবার আলগা ছাড়া ছাড়া আলাপ শুরু করে।

ব্যস। এই মহল্লারই দুটো লড়কা খতম হয়ে গেল……

আকবর আলির বেটা, বেচারী!

বড় রাস্তায় এখনও হয়ত গুলী চলছে। চললেও তার শব্দ এতদূর এসে পৌঁছবে না। মুড়িয়ালি বাগানের সারি সারি কবরের ঢিপিগুলো অনেক পুরনো আর নোংরা দেখায়। বাসি-বাসি ঠেকে সমস্ত আবহাওয়াটা।

কনুইয়ের ওপর মাথা দিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে পাঁচু সেখ। রোগা চেহারা। মাথার কোঁকড়া চুল রুখা হয়ে ফেঁপে উঠেছে। গায়ের পুরু বেগুনী স্ট্রাইপ-দেয়া সুতোর গেঞ্জিটা কালি লেগে লেগে বিবর্ণ। ছাই রঙের ছেঁড়া ছেঁড়া প্যান্টটায় কাঁচা মাটির দাগ লেগেছে কয়েক জায়গায়। ক্লান্ত অস্বস্তিতে পাঁচু বার দুয়েক খালি পা জোড়া ছোঁড়াছুঁড়ি করল। তারপর উঠে বসে থুথু ফেলল দাঁতের ফাঁকে চেপে।

আমি শালা কারখানায় চললুম। কাঁহাতক বসে থাকব? একটা খরিদ্দার ঠিক করে ফেলেছি।

পাঁচুর কথার ওপর কেউ কিছু মন্তব্য করলে না। একটা কাক ঘাড় কাত করে কিছুক্ষণ ডাকল, তারপর উড়ে গিয়ে সামনের ডালটায় বসে খুঁটে খুঁটে কুটো ভাঙল একটা। মুড়িয়ালি বাগানের কোণ থেকে ফাল্গুন মাসের ছোট ঝাঁপা একটা ঘূর্ণি উঠে শুকনো পাতা কয়েকটা উড়িয়ে নিয়ে বেড়াল কিছুক্ষণ।

শালা খুব বেঁচে গিয়েছি গুলী থেকে! জোর বেঁচে গিয়েছি……

চোখ দুটো অর্ধেক বুজে রোদ্দুরের দিকে চেয়ে আপন মনে ঘেঙিয়ে চলেছে পাঁচু। আরো অনেকক্ষণ হয়ত ঘেঙাত পাশের লোকটা ধমক দিল।

চোপ্। মানুষ খুন হয়ে গেল ইদিকে, আর ও শালা পালিয়ে পালিয়ে এসে বলছে কি জোর বেঁচে গিয়েছি।

ধমক দিয়ে লোকটা আবার দুই হাঁটুর ওপর খুতনিটা নামিয়ে রেখে আগের মতো শক্ত হয়ে বসে রইল।

আবার কেমন চুপ হয়ে যায় সবাই। গুলী খাওয়া ও ঢিল ছোঁড়ার তীব্র আবেগটা নিচু মুখে চলেছে। হাতের মুঠোটা ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে।

খলিল, এ খলিল ভাই—

পাঁচু আলগা-আলগাভাবে ডাকল পাশের লোকটাকে, যে ওকে ধমক দিয়েছিল। লোকটা উত্তর দিল না। শক্ত বেঁটে চেহারার তামাটে লোকটাকে কেমন ভয়ংকর লাগে। আর তখন হঠাৎ অকারণে মনে হয়, ঝাণ্ডা আনতে যে লোকটা গেছে সে অসম্ভব দেরী করছে কেন।

শালা ঝাণ্ডা আনবে তো রাত ভোর করবে—

অনেকক্ষণ পরে একটা লোক এল বটে। কিন্তু সে ঝাণ্ডাওয়ালা লোকটা নয়। অন্য একজন। মহল্লার ছোট মসজিদের সামনে বসে থাকত ময়লা রুমাল পেতে। একটা চোখ কানা, পাথরের। কারখানা থেকে ফেরার সময় মজুরেরা দু-চার পয়সা ছুঁড়ে দিত ওই রুমালের ওপর।

বুড়ো লোকটা ওদের কাছাকাছি এসে অনিশ্চিতভাবে থেমে রইল কিছুক্ষণ। যারা বসে ছিল তারা সবাই ওর মুখের দিকে একবার করে তাকাল তারপর চোখ ফিরিয়ে নিলে, কোন কথা না বলেই।

কানা বুড়ো লোকটা শ্লেষ্মাজড়িত একটা অনির্দিষ্ট শব্দ করল বুকের ভেতর থেকে। আক্ষেপের শব্দ। তারপর বসল পাঁচুর পাশে।

ভাবছি কি লড়কা লোগ ক্যাইসা গুলীসে খুন হয়ে গেল। তো ডর হল, নাকি কানতে শুরু করলে, না কি হল...

কেউ উত্তর দিলে না। শুধু পাঁচু কারখানায়-কাজ-করা মোটর মিস্ত্রির

ভোঁতা আঙুলগুলো দিয়ে দাগ টেনে টেনে চিবিয়ে চিবিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল :

খুন হবে না ? মিলিটারি লরি, কত দাম আছে সেটার, বলো—

মাথা না তুলেই খলিল আবার কড়াভাবে ধমক দিল—খামকা বকাবকি লাগিয়েছিস, শাল' তোর মতলব কি আছে ?

কেনে, আমি খারাপ কথা বললুম ? বার কয়েক থুথু ফেলে পাঁচু তার বক্তব্য গুছিয়ে বলতে গিয়েও কেমন থিতিয়ে গেল। কি মনে হতে মস্‌জিদের বুড়োটা শুধু আপন মনে বললে—হাঁ, হাঁ, বহুত দাম আছে, তাই ভাবছি—

তো শালা উ গাড়ী লোকসান করে দিলে তো গুলী চালাবে না ?

হাঁ তাই ভাবছি কি খুন হয়ে গেল লড়কা লোগ—বুড়োটা আপন মনেই বলছে। আর বোকার মতো কয়েকবার ক্লান্ত লোকগুলোর দিকে চাইল পাঁচু। তারপর আবার শুয়ে পড়ল মাটির ওপর।

বহুদূরের একটা আবছা কোলাহল কানে এসে লাগল কয়েকবার। বাতাসের গোঙানি না মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বর চট করে বোঝা যায় না। সবাই চুপ করে থাকে। কিন্তু কেমন উৎকর্ণ দেখায় তা সত্ত্বেও।

ঝাণ্ডা আনতে দিন শেষ হয়ে গেল—

একজন চাপা আশঙ্কা প্রকাশ করল, চাপা অস্বস্তি। রাস্তায় আবার মানুষের ডাক শোনা যাচ্ছে। সমস্ত ক্লান্তি ছাপিয়ে হঠাৎ একটা অস্পষ্ট উদ্বেগে শির্‌শির্ করে পিঠটা।

বাতাস ডাকছে কি মানুষের হল্লা হচ্ছে···

বুড়ো লোকটা তার কথা শেষ না করেই অস্বস্তিতে থেমে যায়। খলিল উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে শুরু করেছে।

শালা জোর বেঁচে গিয়েছি গুলী থেকে। ও শালা আকবর আলির

বেটা—। বলে, কি বে পালাচ্ছিস কেনে। তো ওরই গায়ে তিনটে ফুটো হয়ে গেল। পালাবি না তো থাক্—

পাঁচু হঠাৎ আবার আপন মনে বকতে শুরু করেছে। খলিল ক্ষেপে এসে টুঁটি চেপে ধরল ওর। দাঁতের ফাঁকে চাপা চীৎকার করলে—

একদম শেষ করে দিব। শালা বক্‌বক্ করবি তো একদম শেষ করে দিব। শালা চোর—জানের ভয় লিয়ে ঘুরছে—

মুড়িয়ালি বাগানের কোণ থেকে আবার একটা ছোট ঘূর্ণি উঠেছে। শুকনো পাতাগুলো পাক খেতে খেতে উড়ে গেল কাঁচা কবরটার ওপর দিয়ে। দুটো পাতা আটকে থেকে গেল সেখানে।

ও শালা ঝাণ্ডাবালা লোকটা···

কেয়া মালুম কি হয়েছে। ফিরবে না—

কানের পর্দায় একটা যন্ত্রণার মতো অনুভূতি হচ্ছে। রাস্তা থেকে ভেসে-আসা খোলা আওয়াজটা সহ্য করা যায় না কিছুতে। খলিল পায়চারি থামিয়ে বললে :

হিন্দু মুসলিম—

একসাথ—

সবাই সায় দেবারও প্রয়োজন বোধ করে না। ভাঙা ভাঙা আওয়াজ তুলল কয়েকজন, তারপর ফিরে চলল হঠাৎ। কি রকম অচেনা মনে হয় সবাইকে। ক্লান্ত আর তীব্র। বিড়বিড় করে বকতে বকতে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায় খলিল!

ও শালা আকবর আলির বেটা। বলে, কি বে পালাচ্ছিস কেনে? তো দেখ ওরই কলিজা ফুটো হয়ে গেল, শালা দেখ···

একলা বসে বসে কিছুক্ষণ বকল পাঁচু। মসজিদের বুড়ো লোকটাও অনিশ্চিতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে কোথায়। রাস্তার দিকে হয়ত। সামনে

যারা এগিয়ে গেছে তাদের ভেতর থেকে কে একজন ক্লান্ত আক্রোশে ঘাড় ফিরিয়ে ধমক দিল পাঁচুকে—

শালা চোর ভাগ্ ভাগ্—

মহল্লার পথ ধরল পাঁচু। শুধু শুধু ওদের পেছনে ঘোরা হয়রানি। ওদের রকমের কোন স্পষ্ট মানে ধরতে পারছে না পাঁচু।

মহল্লাটার চেহারা পাল্টে গেছে। পাড়ার মাতব্বররা গিয়ে জুটেছে 'ছোট মসজিদের' চত্বরে। গায়েব জামা খুলে ফেলে খালি গায়ে বসে আছে আকবর আলি। চোখ দুটো কষা লাল—কাঁদছে না। কয়েকজন সান্ত্বনা দিচ্ছে।

শালা দেখেলিস্, আমি মুসলমান আছি—

মরা ছেলের শোকে মাথায় খুন চাপছে আকবর আলির। মাতব্বররা মাথা ঝাঁকিয়ে বলছে—হাঁ, হাঁ, খুন জ্বলতা হয় উনকা···

বস্তির সংকীর্ণ রাস্তাটা লোকে ভর্তি। বড় রাস্তার মোড়েও এমনি অস্থির লোক। মহল্লার কেউ কাজে যায়নি,—দরজী, মিস্ত্রি, বিড়িওয়ালা, কেউ না। রাস্তায় ঘুরছে আর ভীড় জমাচ্ছে। এত সহজে গুলীতে মানুষ মরে যেতে পারে এই আকস্মিক সত্যটাকে ঠিকমত ঠাহর করতে পাচ্ছে না কেউ।

শালা লাগল!

খুন জ্বলতা হয় আকবর আলিকা।

ঘণ্টাখানেক বাদে হাঁপাতে হাঁপাতে পাচু ফিরে এসেছে। হাতে একটা পুঁটলিতে বাঁধা লোহার কি কতকগুলো জিনিস। দেখে মনে হয় বেশ ভারীই হবে। বইতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

ফের গুলী চালিয়েছে ওরা—কয়েকজন লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে পাঁচু হাসল বোকার মত।

এ পাপের রাজত্ব একদম শেষ করে দিব—

ভীড়ের ভেতর থেকে কে একজন ভাঙা-ভাঙা গলায় চীৎকার করছে! আশ্চর্য, গোটা একটা দিন এমনি ভাবেই চীৎকার করেছে সবাই। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আবার চীৎকার করে উঠেছে। একটু দূরে একটা বন্ধ দোকানের সিঁড়িতে বসে আছে সেই মসজিদের কানা ভিখিরীটা। তাকে দেখে আবার হাসল পাঁচু। লাল চওড়া মাড়ির ওপর এবড়ো-খেবড়ো দাঁতগুলো কাঁপলো ঘেন্ডিয়ে ঘেন্ডিয়ে।

জোর বেঁচে গিয়েছি···

পোঁটলাটা ঠিক করে নামিয়ে রেখে পাঁচু আশ্বস্তভাবে ঠেস দিয়ে বসল সিঁড়িটার ওপর। খুশি-খুশিভাবে গামছায় বাঁধা পুঁটলিটা দেখিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—

ইঞ্জিনের পার্টস্, শালা! ভেঙে লিয়ে এসেছি বেঁধে···

অন্ধ কি ভাবছিল বুড়োটা। মোহাচ্ছন্নের মতো জিজ্ঞেস করলে—ফিন গুলী চালালে উ লোক!

অবাক হবার কিছু নেই, তবু কেমন অবাক দেখাচ্ছে ওকে।

চালাবে না, ওর গাড়ী ইঞ্জিন সব লোকসান্ করে দিলে তো চালাবে না? বুড়োটা আবার কি ভাবতে শুরু করে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে। নিশ্বাস টানার সময় বুকের ভেতর শ্লেষ্মার শব্দটা সোঁ সোঁ করে ওঠে। বোবা আওয়াজে নিজের সঙ্গে কথা বলছে ও।

লড়কা লোগ গিয়ে গাড়ী ধরছে, আর পুড়িয়ে দিচ্ছে। হাঁ, বড়োগুলোও যাবে—বলবে কি শালারা আমাদের লড়কাকে খুন করে দিয়েছে তো দেখি ইংরাজকে একদমশেষ করে দিই··

এাঃ ই উ বাচ্চারা গাড়ী ধরেছে একটা, বললুম হোই শালা গুলী খাবি? তো বললে রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। লোক আছে। টেলি-

গিরাফের ভাণ্ডার বাড়ি মেরে ঘণ্টা দিবে। তো বলে কি পুড়িয়ে দেবে—

হাঁ পুড়িয়ে দিবে। বুড়োটা মাথা ঝাঁকাল।

তো আমি বললুম কি শালা থাম, আমি মোটর মিস্ত্রি আছি। ইস্প্রীং ফিস্প্রীং সব খুলে দিচ্ছি। যা পারো নিয়ে যাও। কিন্তু গুলী থাবে ঠিক—তো বলে, পুড়িয়ে দেবে—মিলিটারি কোথায় আসবে এখন···

গাড়ীতে আগুন দিয়ে দাও তো আসমান লাল হয়ে উঠবে···

মোহাচ্ছন্নের মতো মাথা ঝাঁকাচ্ছিল বুড়োটা। হঠাৎ পাঁচু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।—হ্যাঁ? পুড়িয়ে দিবে? কেনে? ওরা ধরলে কি বাবা তোমার পেট্রল টিনটা দিয়ে দাও। আমি মেরেছি আর শালাদের খাঁই দেখ। ইদিকে আমার যে খদ্দের ঠিক হয়ে গেছে শালা···

না বুঝে আবার মাথাটা ঝাঁকাল বুড়োটা। তারপর চুপ করে বসে রইল রাস্তার দিকে চেয়ে। বড়ো রাস্তাটায় কি হচ্ছে বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে মোড় থেকে দৌড়নো পায়ের শব্দ ভেসে আসছে। তখন হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে চারদিক। কতকগুলো ছেলে কোথা থেকে জুটে হাসতে শুরু করেছে হি-হি করে। বোঝা গেল অকারণে ভয় পেয়েছিল ওরা।

লোকগুলোর মাথা পেরিয়ে, বস্তির ঠেকাঠুকো ঘর পেরিয়ে দূরে বিকেলের আকাশে একটা ধোঁয়ার কুয়াশা লাল হয়ে দপদপ করে কাঁপছে।

লোহাতে ভি আগুন ধরে যাবে। না কি বলছ? জোর আগুন হলে জরুর জ্বলে পুড়ে যাবে সব কলকজা। মানলে কি লোহাতে আগুন লাগল না। লেকিন কাঠমাঠ এসব তো জ্বলে যাবে পহেলা···

পাঁচু বুড়োটাকে লক্ষ্য করে করে হঠাৎ তীব্র অস্বস্তি বোধ করল কেমন। সজোরে ধাক্কা দিয়ে সেয়ানার মতো জিজ্ঞেস করলে—

তাহলে গাড়ীটা বেবাক জ্বালিয়ে দাও, সেইটে ভাল হবে—
বুড়োটা মাথা ঝাকাল শুধু মোহাচ্ছন্নের মতো।
কি? ভাল হবে?
অাঁ?
তো জিনিসপত্তর সব পুড়ে খাক হয়ে যাক, সেইটে ভাল হবে? কেনে? ও গাড়ী কার আছে? লোহালকড় ওর বহুত দাম আছে বাজারে। বললুম ভেঙে দিচ্ছি বাবা, লিয়ে যাও যে যে পারো—তো এইটে চুরি করা হল? না কি পুড়িয়ে সব শেষ করে দাও, সেইটে ভাল?
পাথরের চোখ বিকেলের আবছা আলোয় অসম্ভব জ্বলজ্বল করছে বুড়োটার। অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। বললে—হাঁ-তো…
মিছামিছি গালাগালি করছে খলিল ভাই। বলছে কি তু শালা চোর!
বলে কিছুক্ষণ হঠাৎ চুপ করে রইল পাঁচু। আকাশে ধোঁয়ার মেঘটা পাতলা হয়ে উড়ে যাচ্ছে ক্রমশ।
উ শালাবা ফিরবে না। গাড়ী জ্বালিয়ে ছিস তো ফিরে আয় এখন, তা ফিরবে না…
তারপর হঠাৎ হাসল দরাজভাবে। কালো তোবড়ানো মুখে টকটকে লাল মাড়ি, এলোমেলো দাঁতগুলো বিস্ফারিত হয়ে রইল অনেকক্ষণ। কেমন ঘেঁড়িয়ে ঘেঁড়িয়ে পেটের তল থেকে হাসির দমকগুলো খুঁজে নিচ্ছে পাঁচু।
শালা জোর বেচে গিয়েছি। উ আকবর আলির বেটা বললে, কি বে পালাচ্ছিস কেনে—তো—
হঠাৎ গলির মুখ থেকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসতে লাগল লোকগুলো। একটা আতঙ্কিত চাপা শব্দ আসছে কেমন।

আসছে, আসছে।

মিলিটারি।

গোলি চালায়া ফির।

বুড়োটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মোহাচ্ছন্নের মতো এগিয়ে যেতে শুরু করেছে বড়ো রাস্তার দিকে। মাথা ঝাঁকাচ্ছে আপন মনে।

ওই, শালা চলল কোথায় ?

কেমন থতোমতো খেয়ে পাঁচু জিজ্ঞেস করলে একবার। তারপর হঠাৎ অপেক্ষা না করে দৌড় দিল উল্টো মুখে !

মহল্লারই আর একটা বাঁকে নিশ্চিন্তভাবে বসল পাঁচু। চোখ মুখ ভীষণভাবে বসে গেছে ওর। কেমন শুকনো লাগছে ঠোঁট দুটো। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলোয় কুৎসিত দেখাচ্ছে ওর মুখটা।

গামছায় বাঁধা মোটরের যন্ত্রপাতিগুলো খুলে পরখ করতে শুরু করল ও। গামছার খুঁট দিয়ে খাটো খাটো নিপুণ আঙুল ঢুকিয়ে পরিষ্কার করলে ভেতরকার ফাঁকফুঁকগুলো।

পরিষ্কার হয়ে গেলে আবার গামছায় বাঁধল ও। একবার ভাবলে কারখানায় রেখে দিয়ে আসবে। কারখানা মানে, মোটরের মেকানিকের দোকান। তারপর খেয়াল হল বোধ হয়, এই অবস্থায় ফিরে গিয়ে দোকান খোলা খুব নিরাপদ নয়। মিলিটারির গুলী এড়িয়ে গেলেও রাস্তার লোকজন হল্লা করে পুড়িয়ে দেবে দোকানপত্র।

কেয়া মালুম, কি মতলব বেটাদের ! ওই আকবর আলির বেটা। বললে, এ বে পালাচ্ছিস কেনে জানের ভয়ে—ওই শালা ?

আপন মনে বিড়বিড় করে। নোংরা অন্ধকার নেমে এসেছে মহল্লাটায়। এতক্ষণে খেয়াল হল এদিকটা কেমন অদ্ভুত—নিস্তব্ধ। আলো জ্বালছে

না কেউ। কয়েকটা মুর্গী অন্ধকারে ড্রেনের ভেতর কি খুঁটছে। কুকুরগুলো পালিয়ে গেছে কোথায়। চুমকিদার নোংরা হোটেলটার একপাট দরজা শুধু খোলা। ভেতরে অন্ধকারে কেউ নেই হয়ত। চুমকিদার ফাঁকা সিঁড়িটা মাঝে মাঝে ঝিকিয়ে উঠছে হঠাৎ। ভাঙা ঝড়ের মতো একটা শব্দ দুর থেকে ভেসে ভেসে আসছে।

ছোট মসজিদের অন্ধকার চত্বরে মাতব্বররা কেউ নেই। নিস্তব্ধ কালো একটা মুর্তি বসে আছে অন্ধকারে মিশে। দুর থেকে দাঁড়িয়ে অস্পষ্ট আলাপ করলে পাঁচু—উ কাঁহা গিয়া, আকবর আলি ?

চলা গিয়া রাস্তা মে—নিস্পৃহভাবে উত্তর দিয়ে আবার ঝিমিয়ে বসে রইল লোকটা।

চলা গিয়া তামাম আদমী ?

লোকটা এবার আর কোন উত্তর দিলে না। অনেকক্ষণ উৎসুকভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেল পাঁচু ঃ

ই কিরে বাবা···

ফাঁকা মহল্লাটায় এলোমেলোভাবে খানিক ঘুরল পাঁচু। বিড়ি খাওয়ার ইচ্ছে হল একবার। দোকান বন্ধ।

এ মহল্লাটা পেরিয়ে পেছন দিকে আরেকটা মহল্লায় দেশী মদের দোকান খোলা ছিল একটা। একটু ইতস্তত করে ঢুকে পড়ল।

চেনা ভেণ্ডারটার সঙ্গে আলাপ করলে কেমন শুকনো কাঁপা গলায়।

শালা মেরে লিয়ে এসেছি। বললুম যে বাবা ইস্ক্রুপ বোল্টু সব খুলে দিচ্ছি, লিয়ে যাও ভেঙে, দাম আছে এ বাজারে—দাও মাইরি, খাই খানিক—

দাম আছে, উ লোহার ভি দাম আছে, রোগা মুর্গীর মত একটা লোক সায় দিল ক্যাককঁ্যাক করে। মদের বোতল নিয়ে নড়বড়ে কাঠের বেঞ্চিটায় বসে রইল পাঁচু। এখানে লোক আছে, আর তারা ওর কথাতে সায় দেবে—

একটা খরিদ্দার ঠিক করে দাও মাইরি ? শালা জলদি বিচে দিব এসব—
হঠাৎ থামল পাঁচু। দু-এক ঢোক মদ খেলে, তারপর বললে—
পাপের মাল আছে—বিচে দিব···
এ্যাই পাপের মাল ! বিচে দাও, দু-চার রূপেয়া পকেটে ফেলে দোস্তভাই-দিকে খিলাও—হাঁ—
সামনের বেঞ্চি থেকে একটা মোটা মতো লোক টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে ভীষণ চীৎকার শুরু করেছে। মাতাল মাথাটা ঝাঁকিয়ে রুখে রুখে আসছে অন্য লোকগুলোর দিকে, মারবার মতো ভঙ্গী করছে—মারছে না।
হারামী আছিস্ ! হাঁ তুই, শালারা বিলকুল হারামী—ওঠ্ ওঠ্ বলছি। ওদিকে কি হচ্ছে তাই আমাকে বল্। বল্ শালারা, গুলী চলছে কি, মানুষ খুন হল কি না বল—
পুঁটলিটা খুলে চুরি-করা যন্ত্রগুলো আবার পরিষ্কার করল পাঁচু। গামছায় বাঁধা পুঁটলিটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল।
উ শালা খলিল থামকা গাল দিলে আমাকে, তো কি এটা চুরি করা হল ? অস্পষ্ট অনিশ্চিত প্রশ্ন করলে পাঁচু পাশের লোকটাকে। পাশের লোকটা এবার ঠিক বুঝতে পারলে না কি উত্তর দিতে হবে। মোটা মতো লোকটার মুখের কস বেয়ে ফেনা বেরোচ্ছে। ঝুঁকে ঝুঁকে আসছে আর অশ্লীল গালাগালি দিচ্ছে। কার উদ্দেশে কে জানে। ঘুষি মারছে কাঠের বেঞ্চিটার ওপর :
খুন হয়ে গেল রাস্তায়, কি না তুই বল্ আমাকে—হঠাৎ পাঁচু আর কিছু বললে না।

অন্ধকার থম্‌থমে হয়ে উঠেছে চারদিকে। খুন হওয়া মানুষের রক্ত ভেসে ভেসে ওঠে চোখের সামনে। নিঃশব্দ টায়ারের চাকা ছিঁড়ে দিয়ে

যায় কালো পীচের ওপর নোংরা রক্তের দাগ। দ্রুত ক্ষণস্থায়ী আর্তনাদের পরেকার নিস্তব্ধতা ঢেউ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

অল্প টলতে টলতে বড়ো রাস্তায় ফাঁকা ফুটপাথের ওপর দিয়ে হাঁটছে পাঁচু। অন্ধকারের ভেতর থেকে হঠাৎ শক্ত ক্লান্ত হাতে খলিল টেনে আনল ওকে। তীব্রভাবে ফিস্ ফিস্ করে উঠল :

কিধার যাতা ?

খলিল ভাই ?

হাঁ খলিল তো ঠিক হয়, লেকিন কিধার যাতা তোম্ ? ঠার যাও—

শান্তভাবে পাঁচু বসল ফুটপাথের ওপর। অন্ধকারে, দূরে রাস্তার ওপর একটা কালো স্তূপ উঁচু হয়ে আছে। ওইখানে রাস্তা বেঁধেছে ওরা। গাড়ী আটকাবে সারা রাত ধরে। কত লোক মরবে কে জানে।

আকবর আলিকা কেয়া খবর ?

বুকে গুলী লেগেছে বেচারী···চাপা বসা গলায় উত্তর দিল খলিল, বেটাও গেল, বাপটাভি গেল।

মাঝ রাত্তিরে আর কিছু মেলেনি। অন্ধকারে ভাল বোঝা যাচ্ছে না। ঠেলা গাড়ীটার ওপর তাড়াতাড়ি পাঁচুকে চাপাল ওরা কয়েকজন।

নিঃশব্দ মিলিটারি গাড়ীটা এসে যখন হঠাৎ গুলী চালাতে থাকে, তখন একটা বুড়ি দাঁড়িয়ে খামকা গাল দিচ্ছিল কাকে।

কি মনে হয়েছিল পাঁচু হাতের পুঁটলিটা ছুঁড়ে মেরেছিল গোরা সৈন্যটাকে লক্ষ্য করে।

কোথায় গুলী লেগেছে কে জানে। অন্ধকারে ধরে তুলে তুলতে চ্যাটচেটে পিছল রক্তের স্পর্শে শিউরে উঠল আঙুলগুলো।

গাড়ীটার ওপর আরো জন দুই আহত পড়ে আছে। ঠেলাগাড়ী।
এম্বুলেন্স্ আসে নি।
মহল্লার এবড়ো-খেবড়ো অন্ধকার রাস্তাটায় পড়ে লাফাতে শুরু করেছে চাকাগুলো। বসা গলায় খলিল আফসোসের শব্দ করল শুধু—মরে যাবে শালা চোর!
খলিল ভাই—
ঠেলাগাড়ী থেকে ঘেঙিয়ে ঘেঙিয়ে বলছে পাঁচু—খলিল ভাই, উ গাড়ী কার আছে, তোমার আছে, না আমাব আছে, না ইংরেজের আছে? তো জরুব খুলে লিয়ে আসব—তামাম গাড়ী ইঞ্জিন খুলে লিয়ে আসব·· ···

দূরে ভুটান পাহাড়ের নোংরা নীল পিঠ কুঁজো হয়ে উঠেছে। নীচে পাহাড়তলীর ছাইরঙা মাটির ঢালুতে ঝোপ ঝোপ হয়ে ছড়িয়ে আছে বাগানের পর বাগান। মাইলের পর মাইল জুড়ে ডুয়ার্সের চা এলাকা গিয়ে মিশেছে আসামের পাহাড়ে।

এখানে তারা জন্মায়নি। এখানকার মানুষ নয় তারা। মদেশী, মুণ্ডা, বিলাসপুরের আর ছোটনাগপুরের অধিবাসী—ঝুঁটি-বাঁধা লম্বা চুল, লোহার বালা-পরা পাকানো কব্জি, নেংটি-পরা বুনো মানুষ—থাক থাক মাংসের ভাঁজে শক্ত কালো, পিঠ এখানকার হাওয়ায় শিটিয়ে আসে। নীচু হয়ে চায়ের পাতা তুলতে তুলতে বেঁকে যায় কোমরের হাড়। ম্যালেরিয়া ধরে—চা বাগানের দুরন্ত ম্যালেরিয়া।

কিন্তু দেশে ফিরে যায় না কেউ। যারা পালাবার চেষ্টা করেছে—পনের বিশ বছর পরে যারা ছুটি পেয়েছে, দু মাস যেতে না যেতেই তারা ফিরে

হটাবাহার

এসেছে আবার। ঠিকাদারের হাতে পায়ে ধরেছেঃ
'ক্ষেতি গিরস্তি কিছু নাই দেশে। কি করব বল বাবু?'

পনের বিশ বছর আগে আদিবাসিদের নীচু দেয়াল ঘেরা মাটির ঘরে এসে বসেছিল একজন। চকচকে পেতলের বোতাম-আঁটা কোট পরা, নিকেলের চেন ঝুলানো, লোহার নাল মারা কালো চামড়ার জুতো পায়ে।
'ক্ষেতি গিরস্তি কিছু নাই তোদের?'
মোচে পাক দিতে দিতে ছোটনাগপুরের শক্ত বেঁটে গেরুয়া পাহাড়ের অনুর্বর মাটির দিকে চেয়ে বলেছিল ঠিকাদারবাবু। জংলী মানুষরা হাঁ করে চেয়ে থেকেছে কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ একসঙ্গে সায় দিয়ে ফেলেছে সবাই।
'কোথা পাবি? কিছু নাই। ধান পান কিছু নাই আমাদের। জমিগুলি কেড়ে লিলে উয়ারা—'
এ বস্তি আর ও বস্তি এ গাঁ আর ও গাঁ থেকে আরো লোক জুটেছে। সবাইকে একসঙ্গে করে নিয়ে এসেছে স্টেশনে। নিজের পয়সা খরচ করে হলদে হলদে পুরু পুরু টিকিট কিনেছে লোকটা। সযত্নে তা রেখে দিয়েছে চেন্ ঝুলানো কোটের বুক পকেটে।
'কোথায় লিয়ে যাবি আমাদের?'
'খাটবি। পয়সা মিলবে। হাঁড়িয়া খাবি? কি বলছিস রে, সোমন?'
'হাঁ পয়সা মিলবে খাটবো...'
তারপর অপরিচিত পাহাড়—অপরিচিত বোবা মানুষ। হাজার একর বাগানের বাইরে পা বাড়াবার হুকুম নেই। দেশে পালাবার চেষ্টা যে করেছে, চৌকিদারের হাতে ধরা পড়ে ফিরে এসেছে সে।
পনের বছরের মধ্যে নাকি দেশে ফেরা চলবে না। ঠিকাদারবাবু টিপ সই নিয়ে রেখেছে।

হাজার একর বাগানটাকে দেখায় একটা নিস্তব্ধ জেলখানার মতো। কাঁটা-তারের বেড়ার পাশে পাশে কড়া নজর রেখে বসে আছে চৌকিদারেরা। দেশে ফিরে যেতে চায় না কেউ। ছেলে মেয়ে যোয়ান বুড়োর একটা কুৎসিত দুর্বল উপনিবেশ আবদ্ধ জলের মতো গাঁজিয়ে ওঠে। হাঁড়িয়া খেয়ে কুলী লাইনে লাইনে ভাঙা ভাঙা হল্লা করে। হল্লা থেমে গেলে হঠাৎ একদিন কি মনে পড়ে যায় আবার। চাপা কান্নার মত নীচু একঘেয়ে সুরে হঠাৎ গান গাইতে শুরু করে কয়েকজন। বুনো অস্পষ্ট গান। হঠাৎ তেমনি আকস্মিকভাবে থেমে যায় একসময়।

তিরিশ চল্লিশ বছরের এমনি আতঙ্কিত জীবনযাত্রা ঘা খেয়ে থমকে গেল একদিন। বাজারে ধানের দর উঠেছে তের টাকা মন।

'পাঁচ আনা হাজিরা দিবি তো কি খাব, কি করব?'

যারা জিজ্ঞেস করল তাদের আতঙ্কিত মুখ চোখ কেমন রুক্ষ দেখাল। অনেকদিন বাদে চা বাগানের গুদামের দিকে আঙুল দেখিয়ে অনিশ্চিত-ভাবে জিজ্ঞেস করলে কয়েকজন—'কত ধান রেখেছিস ওখানে?'

কিন্তু আর কিছু হয় না। আকাল শুরু হতে বছর তিনেক হল বাগানের ভেতর চা বাগানের পাশে আরো একটা গুদাম উঠেছে। চায়ের নয় চালের। খাসমহল্লের বনজঙ্গলে লুকানো জোতদারদের হাজারমনী গোলা থেকে লরী বোঝাই ধান আসে গুদামে। রাত্রের অন্ধকারে আবার বেরিয়ে যায় কোথায়। গুদামের দরজায় ডবল পাহারা বসিয়ে বড়বাবু হেসে বাগানবাবুকে বলেন—

'টাকা রোজগার নিয়ে কথা। না কি বলো হে?' উত্তরে কুলী মেয়েদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে টিপে হাসে বাগানবাবু। হাসে আর চোখ টেপে।

'তিন সের রেশন তো কজন লোক খাবে ?'
কুৎসিত চেহারার কুলী মেয়েরা অনিশ্চিতভাবে জিজ্ঞেস করে। তারপর উত্তর না পেয়ে ফিরে চলে যায়।

তাই রবিবারের হাটে ভীড় করে সবাই। বিস্তীর্ণ ডুয়ার্স এলাকা জুড়ে বাগানে বাগানে সপ্তাহে একটা দিন মজুরি বন্ধ—কাজ বন্ধ। কোম্পানীর জমিদারীতে হাটখোলায় হপ্তায় কড়ি গুনে সওদা কেনা বেচা চলবে। বাগানের বাইরে খোলা রাস্তায় সপ্তাহে একদিন ছুটি।
বড় বড় ফুটো করা কানের ভেতর লাল কাগজের অলংকার। পিঠে ছেলে বেঁধে রুক্ষ চুলে তেল মেখে কুলী মেয়েরা ঘোরাঘুরি করে ধানহাটির আশে পাশে। কিছু বলে না। হয়রান হয়ে মরদেরা গিয়ে বসে দূরের গাছতলায়। কড়া তামাকের চুরুট বানিয়ে ধোঁয়া টানে। অকারণে ঝগড়া বাধায় অন্য কুলীর সঙ্গে। ঝগড়া করে ক্লান্ত হয়ে আক্রা দরের চাল কিনে নিয়ে যায় কোঁচড়ে বেঁধে।
'কি হল দেশটায় ? টাকায় তিন সের ধান ?'
'তো গুদামে পাহারা বসালে কেনে ওরা ?'
'দুটো চৌকিদার বসালে কেনে ?'
ধান কেনে না শুধু শুকরা মুণ্ডা।
শক্ত লম্বা শরীরের ওপর ওর ছেঁড়া ফতুয়াটা আঁট হয়ে বসেছে। নেংটির নীচে শক্ত পা জোড়া অসম্ভব ঢেঙা দেখায়। পায়ের ডিমের ওপর সাপের মত কালো শিরার জট কুঁকড়ে উঁচু হয়ে আছে।
'টাকায় তিন সের ধান কেনে লিব ?'
খাসমহলের দেশী আধিয়ার চাষীরা খালি বস্তা বগলে করে গুম হয়ে ঘোরাঘুরি করে। বস্তা খুলে স্তূপ করে ধান রেখেছে পাইকাররা। হাওয়া

দিয়ে ওপরকার ভুসি আর ধুলো উঁড়িয়ে দিচ্ছে আর হঠাৎ তকতকে পরিষ্কার হয়ে উঠছে ধানের গা।

দাঁড়িয়ে থেকে থেকে অনেকক্ষণ পরে কাঁপা হাতে ময়লা মোট নিয়ে এগিয়ে আসে দু-একজন। বস্তার মুখ ফাঁক করে সতর্কভাবে চেয়ে থাকে দাঁড়িপাল্লার দিকে। টাকা নিয়ে পাইকার যে ধান মেপে দেবে তাতে বিরাট বস্তাটার একটা কোণও ভরবে না।

শুধু ঢেঙা মদেশী কুলী শুকরা মুণ্ডা সন্ধ্যে পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে ধান-হাটির পাশে। কিন্তু ধান কেনে না। তার বদলে কখন একসময় ভাটিখানায় ঢুকে পড়ে ও।

যখন বেরিয়ে এল তখন ওব ঢেঙা ঠ্যাং জোড়া দুলছে ঝড়ে নাড়া খাওয়া শাল গাছের মতো। মুখের কস বেয়ে হাঁড়িয়ার ফেনা খানিকটা জমে আছে নোংরা হয়ে।

যারা ধান কেনে আর যারা ধান কেনে না সবাই চলে যায় আস্তে আস্তে। নির্জন হয়ে আসে কোম্পানীর হাটখোলা। রাস্তার কোণে ঘোলাটে আলো জ্বালিয়ে টিম টিম করে মানসিং-এর চাখানা।

'চা খাবো আমরা, চা দে—'

দোকানের সামনে পাটাতনের ওপর উঁচু হয়ে বসে শুকরা মুণ্ডা। দোকানের মালিক ভুটিয়ালী মানসিং চুল্লীর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা বেঁকিয়ে নিস্তব্ধভাবে চা বানায়। একটা চোখ ওর কানা। জামার নীচে পিঠে হাতে আর কাঁধে আরো কয়েকটা ক্ষতচিহ্ন লুকিয়ে রাখে ও। তখন ও কুলীর কাজ করত বাগানে। সেই বাগানের বড় সায়েব একদিন পাহাড়ের ওপর শিকার করতে গিয়ে যত কটা গুলী ছুঁড়েছিল সবকটাই এসে লেগেছিল চা-কুলী মানসিং-এর দেহে। পাহাড়ী কুলীর জান—তাই

মরে গেল না বোধ হয়। দশ টাকা বকশিশ দিয়ে সায়েব বলেছিল— ভাগো আমার বাগান থেকে।

বোকার মতো প্রথম হাত তুলে সেলাম দিয়েছিল মানসিং। দশ টাকা বকশিশ পেয়ে কেমন খুশি হয়ে গিয়েছিল সে। বড় সায়েবের কাছে যতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল শুধু ততক্ষণ।

কিন্তু তারপর থেকে আতঙ্কের তীব্র একটা ছায়া ভোঁতা চামড়ার মতো এঁটে বসেছে ওর কানা মুখের ওপর।

চাথানার বেঁটে বোচা ছুকরী মেয়েটা শুকরাকে চায়ের গেলাস এগিয়ে দিয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়ায়।

ভাল লাগে মেয়েটিকে। সারাদিন একটার পর একটা ফাইফরমাস খেটে যাচ্ছে। জল বইছে, বাসন ধুচ্ছে, জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে আনছে পাহাড় থেকে। যারা নেশা করে আসে তাদের ভাল লাগে। লম্বা চওড়া কথা বলতে ইচ্ছে করে। গোর্খালী চৌকিদারেরা ভোজালি উঁচিয়ে হিম্মৎ দেখায়!

টিম্‌টিমে দোকানের ভেতর থেকে হঠাৎ মানসিং মাথা ঝাঁকাতে শুরু করে।

'পহলে তো হাম চা-কুলী থা। তো কেয়া দেখা কি বড়াসাব ইধারসে গিয়া তো বিলকুল ভাগ গিয়া কামিন লোগ। ইতনা ডরতা থা কামিন লোগ···'

'কি বলছিস তুই?'

চোখ কুঁচকে মাথার টাল সামলাতে সামলাতে শুকরা তাকায় মানসিং-এর দিকে। কসের ওপরকার হাঁড়িয়ার ফেনাটুকু চাটতে থাকে বোকার মতো। ভুটিয়া টান মেশানো আধা হিন্দিতে আপন মনে বলে চলে মানসিং:

'পহলে কেতনা ডর থা। আভি কেয়া হুয়া? আঁখ দেখা কুলী লোগকা?'

হায়রে বাপ! রূপেয়ামে তিন সের চাউল। খরিদ করনে নেহি সকা। লেকিন আঁখ দেখা উন্‌লোগোঁকা ?...'

কিন্তু সোমবার থেকে অন্য তাগিদ আসে। কিন্তু ধান কিনেছে অথবা মোটেই ধান না কিনে যারা হাঁড়িয়া খেয়ে এসেছে সবাই সকালবেলার বাসি মুখে বেতের টুকরী নিয়ে ধীরে ধীরে বাগানের পথে পা বাড়ায়।

আশ্বিনের প্রথম। দু মাস ধরে বেঁটে বেঁটে চা গাছগুলো কচি পাতায় ছেয়ে যাচ্ছে। 'হুড়পাতি' বলে এই সময়টা। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি দামী নতুন পাতাগুলো তুলে নিতে হবে এখন। যত তুলে নেওয়া যাবে তত নতুন পাতা গজাবে এই সময়টা। এখন কাজ কামাই হওয়া মানে বিস্তর লোক-সান। কোম্পানী আইন করে দিয়েছে—যত পাতা টিপতে পারবে তত পয়সা।

তবু কতই বা হয়। দিনের শেষে সাত আনা আট আনা।

পা টিপে টিপে কষ্টে হাঁটছিল মুংলী, শুকরার বৌটা। পেটের ভেতর দশ মাসের ছেলে নিয়ে কত পাতাই বা ও টিপবে। কতই বা রোজগার করবে। কাল রাতে মিছিমিছি পয়সা উড়িয়েছে মনে পড়ে উশখুশ করে শুকরা। ঘরে ছ-বছর আর চার বছরের দুটো বেটা আছে শুকরার। খিদের জ্বালায় এতক্ষণ নোংরা উঠানে পড়ে বেড়ালের বাচ্চার মতো আঁচড়া আঁচড়ি করছে হয়ত।

'তুই ফিরে যা মুংলী। একলা দু-টুকরী পাতা টিপব আমি—'

কষ্ট হচ্ছিল মুংলীর। মাটির ওপর বসে জিরিয়ে নিল খানিক তারপর আবার পা ঘষে ঘষে হাঁটতে শুরু করল।

'তুই ফিরে যা মুংলী—'

'ধান পান নাই ঘরে। একটা মরদ কত কামাই করবে? দুজন না খাটলে মারা যাবে ছেলেগুলা—'

ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ তুলে ক্লান্ত প্রশ্ন করে কুৎসিত চেহারার জংলী মেয়েটা।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু টুকরীর সিকি ভাগও ভরাট হল না মুংলীর। শুকরা জানতে পারেনি। কাজ শেষ হবার ঘণ্টা বাজার আগে একটা বুড়ি কুলী মেয়ে শুকরাকে খবর দিল—

'তুই পাতা টিপছিস শুকরা? মুংলী পড়ে আছে পছিম বাগানে—'

তাতে অবশ্য ব্যস্ত হবার কারণ নেই। এরকম তো হয়েই থাকে। ঘণ্টা বাজার আগ পর্যন্ত পাতা তুলে টুকরী ভরে যেতে হবে শুকরাকে। নয়ত দু-চার পয়সা কম মজুরি মিললে মন বিগড়ে থাকবে সারা দিন।

ঘণ্টা বাজলে মুংলীর কাছে গেল শুকরা। এতক্ষণ শুয়েছিল মুংলী—এইবার উঠে বসেছে। সদ্যপ্রসূত তামাটে লাল বাচ্চাটাকে শুইয়ে রেখেছে মাটির ওপর।

'ঘরে চল শুকরা—'

'চল'

ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতেও হাঁপিয়ে উঠেছে মুংলী।

'কাল থেকে তোকে একলা খাটতে হবে শুকরা—'

আক্রা দরের ধান যারা কিনেছিল, আর ধান না কিনে যারা হাঁড়িয়া খেয়ে হপ্তার কড়ি বেহিসাবী খরচ করে এসেছিল—তাদের প্রত্যেকের অবস্থা সমান হয়ে আসে তিন দিন পর। হপ্তা শেষ না হলে মজুরি মিলবে না। ধানের পর মকাইয়ের ছাতু—তাও শেষ হয়ে যায়।

বাঁকাচোরা সারবন্দী কুলী লাইনটা অত্যন্ত নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। সারাদিন খাটুনির পর অর্ধেক লোক কাত হয়ে পড়ে থাকে স্যাঁতসেঁতে মেঝের

ওপর। অর্ধেক লোকের ঘরে এক কণা দানা নেই। ভুখা, স্রেফ ভুখা। হি হি করে কেঁপে বড় ছেলে ছুটোর জ্বর এসেছে। কচি ছেলেটাকে বুকের কাছে টেনে মুংলী হঠাৎ ফ্যাকাশে গলায় ডাক দেয়ঃ

'শুকরা'

'কি বলছিস ?'

'আমাকে ছেড়ে তুই পালাবি শুকরা ?'

ক্লান্ত সন্দেহে মুংলী তাকায় শুকরাব দিকে। ঘরে ঘরে এমনি সন্দেহ উঁকি দেয় প্রত্যেকেরই মনে। যে মরদ খাটতে পারে সে কেন অক্ষম বৌ ছেলের জন্যে উপোস দেবে। যে মেয়ের গতর আছে সে কেন বুড়ো বাপের জন্যে আক্রা ধান কিনে দিয়ে নিজে শুকিয়ে থাকবে ?

কুল কিনারা না পেলে তাই একদিন চা বাগানের কুলীকে পালাতে হয়। যে মেয়ের গতর আছে তাকে ফুসলিয়ে বার করে এনে কাজ নেয় দূরের বাগানে। আর, তেমন দোষ দেয় না কেউ। শুধু অক্ষম বৌটা পড়ে পড়ে গাল দেবে কিছু দিন—বুড়ো বাপটা শুকিয়ে মরে থাকবে কুঁড়ের ভেতর। আর, তেমন দোষ দেবে না কেউ।

'আমাকে ছেড়ে তুই পালাবি শুকরা ?'

কাঁপা আতঙ্কে বার বার জিজ্ঞেস করে মুংলী।

'সে কথা কেনে বলছিস তুই ?' বিরক্ত হয়ে শুকরা অন্যদিকে তাকায়। দেবতার জন্যে মানত করা মুর্গীটার ঠ্যাং ধরে সন্ধ্যে রাত্রে গঞ্জে রওনা হয়ে যায় তারপর। গঞ্জের মুদী-দোকানে ধানের দর আরো বেশী—টাকায় আড়াই সের।

রাত একটু বেশী হলেও ফেরার পথে মানসিং-এব দোকানে বসে যায় একটু। কাঠ ফেড়ে ফেড়ে আগুন জ্বালাচ্ছে দোকানের মেয়েটা। রাত দিন

খাটছে ও। গোল পাহাড়ী মুখের ওপর আগুনের ছায়াটা দপ দপ করছে। অন্যমনস্কভাবে শুকরা তাকিয়ে থাকে মেয়েটার দিকে।

হাত পা আগুনে সেঁকতে সেঁকতে মানসিং খবর দেয় ভাঙা হিন্দিতে 'কেয়া কিয়া, রাতমে গাড়ী গিয়া তো বোলা ঠারো। লেকিন লুঠ কিয়া নেই। বোলা রূপেয়া মে সাত সের লেও। পান শও আদমী তামাম গাড়ী রুখ দিয়া—খাসমহলকা আদমী। বোলা রূপেয়ামে সাত সের লেও...'

অবাক হয়ে যায় শুকরা। কিছু বলতে পারে না। হঠাৎ লুব্ধভাবে জিজ্ঞেস করে—'আমাদের গুদামটায় কত চাল আছে তাহলে?'

'পান শও আদমী লাঠি উঠায়া। বোলা রূপেয়ামে সাত সের লেও—'

আগুনে হাত সেঁকতে সেঁকতে মানসিং একটানা বকে যায়। ওর মুখের ওপর ভোঁতা আতঙ্কের ভাবটা হঠাৎ যেন ঘোরালো হয়ে উঠেছে।

দ্রুত পা চালিয়ে কুলী লাইনে ফিরে আসে শুকরা।

বাগানে ঢুকতেই এসে পথ আটকাল একজন চৌকিদার; অন্ধকারে আগুন জ্বালিয়ে বসে আছে আরও কয়েকটা মূর্তি! হঠাৎ পাহারার কড়াকড়ি শুরু হয়ে গেছে এখানে?

'কিধার গিয়া থা? বাহাবমে মাৎ যানা। যায়েগা তো আনে নেহি দেঙ্গে—'

'হুকুম হোগিয়া—'

'ধান কিনতে দিবি না তোরা?'

'মাৎ যানা। ইয়ংটাং বাগানামে কেয়া হুয়া? রেশনকে বারেমে মারপিট শুরু কর দিয়া কুলী লোগ। ও? তুম্ ভি বদমাসী মতলব লেকে ঘুমতা? মাৎ যানা—সাহেব কা হুকুম—'

অল্প রাত হতেই গোটা কুলী লাইনটা একেবারে নিঝুম হয়ে পড়েছে। অন্ধকারে ভাঙাচোরা সারি সারি ঘরগুলো ছায়া হয়ে জেগে আছে শুধু।

শুকরার সাড়া পেয়ে একটা কুকুর নীচু গলায় কয়েকবার ডেকে চুপ করে গেল।

'বুধন, এ বুধন—...'

বুধনের নীচু দাওয়ায় উঠে হাঁকাহাঁকি লাগায় শুকরা। না, বুধন ঘুমায় নি। কুলী লাইনের কেউ ঘুমায় না, শুধু খিদে আর খাটুনিতে মড়ার মতো পড়ে ছিল সবাই—কেউ ঘুমায় নি।

উত্তেজিতভাবে শুকরা খবর দিল সবাইকে। বাড়ী বাড়ী গিয়ে। কি হয়েছে? না খাসমহলের চাষীরা সবাই চালের গাড়ী রুখে দিয়েছে। লাঠি উঁচিয়ে বলেছে টাকায় সাত সের চাল দিতে হবে—কিন্তু লুঠ করেনি ওরা।

আর ইয়ংটাং বাগানে মার দাঙ্গা শুরু করে দিয়েছে কুলীরা—সবাই শুনল কথাটা। একই কথা শুনল বার বার করে। চাপা লোভে একই কথা জিজ্ঞেস করল বার বার করে। তারপর ফিরে গেল নীচু অন্ধকার কুঁড়েগুলোয়। আর কেন জানি ঝগড়া করতে শুরু করল নিজেদের মধ্যে। একটা অনির্দিষ্ট চাপা রাগে হাত মুঠ করে রুখে রুখে উঠল, একজন আর একজনের ওপরে।

মাঝরাত্তিরে তাদের অকারণ চীৎকার ফাঁপা হল্লা হয়ে ছড়িয়ে গেল পাহাড়ে পাহাড়ে।

'পাঁচ আনা—'

'সাড়ে ছয় আনা—'

'সাড়ে ছয় আনা—'

'ন আনা! আরে বাপ বহুত হোগিয়া তোমকো—'

'পাঁচ আনা—'

মুখস্ত বলার মতো করে বাগানবাবু হাজিরা হিসাব করে দিচ্ছেন। টাটকা তোলা কচি চা পাতার গন্ধে জায়গাটা ঝাঁঝালো হয়ে উঠেছে। এক একটা টুকরী টেনে এনে ওজন করার যন্ত্রে ঝুলিয়ে দিচ্ছে কুলীরা। এক ঝলক তাকিয়ে দেখছেন বাগানবাবু আর হাজিরা হাঁকছেন।

একলা তিন টুকরী পাতা টিপেছে শুকরা। একলার রোজগারে পাঁচটা প্রাণীকে খাওয়াতে হবে। তিন টুকরী পাতা আগলিয়ে জানোয়ারের মতো হাঁপায়।

'এক টাকার কম লিব না—'

শুকরা আগে থেকে সতর্ক করে দেয় বাগানবাবুকে। বাগানবাবুর তাকিয়ে দেখারও সময় নেই। একঘেয়ে হাজিরা হেঁকে যাচ্ছেন আর ওজন দেখছেন।

যত ওজন হয় খাতায় তা লেখা হয় না। সেরের ওজন পাউণ্ড বলে চলে। মাথা মুণ্ডু কি হিসেব হয় লেখাপড়া না জানা জংলী কুলীরা কেউ ঠাহর পায় না। জিজ্ঞেস করলে জবাব মিলেছে ওজন কাটতে হবে না। পাতার সঙ্গে জলের ওজন মাপতে হবে নাকি? কোম্পানী শুকনো পাতা চালান দেয়—কুলীরা রসালো কচি পাতা তুলে এনেছে। লোকসান হবে কার?

'একটাকার কম লিব না—'

শুকরা ঘাড় টান করে আবার জানিয়ে দেয়। বাগানবাবু কেয়ার না করে টুকরী চাপাতে বলে—

'আট আনা···কুড়ি সের ওজন কেটে নিলাম তোর—'

'কুড়ি সের?' জঙ্গলের বাঘের মতো স্থির হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে শুকরা তারপর হঠাৎ গোঁয়ার দুই হাতে টুঁটি চেপে ধরে বাগানবাবুর।

'কুড়ি সের কেটেছিস তুই বাবু? আট আনা মজুরি দিবি আমাকে?'

হঠাৎ যেন পাগলা ঘন্টি বেজেছে পাহাড়তলীর জেলখানায়। একসঙ্গে রুখে দাঁড়িয়েছে নির্বাসিত কয়েদীরা।

'মজুরি কাটবি—ধান দিবি না?

'ধান দে আমাদের—ভুখে আছি—'

মদেশী আর ভুটানী মেয়েরা চীৎকার করছে গলা ফাটিয়ে। কি করতে হবে বুঝতে পারছে না—রুখে রুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে কুলী মরদেরা।

বড় সায়েবের কুঠি থেকে গুলী ছোঁড়ার শব্দে গণ্ডগোলটা আচমকা থেমে গেল। স্তম্ভিতভাবে এর 'ওর দিকে তাকাল কুলীরা। বুধন কুলী টুকরীর ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছে।

নিঃশব্দে টুকরী চাপাতে লাগল ওজনের যন্ত্রে। কি করতে হবে কেউ জানে না।

অস্বাভাবিক রকমের গুম মেরে আছে কুলীরা। তীব্র টর্চের মুখে জঙ্গলের পথ যেমন পাথর হয়ে যায়। বিচক্ষণ শিকারীর চোখ সতর্ক হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে।

'এক সের করে ধান বিলি করে দিন বড়বাবু—চারদিকে বড় হাঙ্গামা হচ্ছে।'

পাগলা হাওয়ার ধুম পড়ে গেছে জঙ্গলে। হাওয়া পালটিয়েছে। জংলী লতাপাতার অপরিচিত গন্ধের টানে পাগলা হয়ে উঠেছে জানোয়ারের পাল। ছোট সায়েব ইতস্তত করে জানালেন—'ধান তো নেই। পরশু রাত্রে যে ট্রাক গেছে সেই শেষ—'

সন্ধ্যেবেলায় শুকরার ডাক পড়ল সায়েবের কুঠিতে। দুজন চৌকিদার ধরে নিয়ে এল শুকরাকে। বাংলোর বারান্দায় চাবুক হাতে করে বড় সায়েব পায়চারি করছে। ঘরের ভেতর থেকে সিল্কের পর্দাটা সরিয়ে

উৎসুকভাবে চেয়ে আছে সায়েবের রক্ষিতা কুলী ছুকরীটা। নির্বোধ কৌতুহলে ওর গোল গোল চোখ দুটো চক্ চক্ করছে।

চাবুকের দাগে দাগে রক্তের সঙ্গে ছেঁড়া ফতুয়াটা কেটে বসেছে পিঠের ওপরে। কুঠি থেকে টলতে টলতে নেমে এল শুকরা। হটাবাহার। চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর বাগান ছেড়ে দিতে হবে ওকে। ঘরে ঢুকে লাঠি মেরে মেরে জিনিসপত্র তছনছ করে দেবে চৌকিদারেরা। পোড়া মাটির হাঁড়িকুঁড়ি ফাটিয়ে ছত্রখান করবে—নিষ্ঠুর আনন্দে ধুলোয় ছড়িয়ে দেবে মকাইয়ের ছাতু, ধান ভানার অবশিষ্ট খুদ।

কোন বাগান আর চাকরি দেবে না ওকে। কাল সকালে বড় সায়েবের সই করা চিঠি চলে যাবে সব জায়গায়—

এক বদমাস কুলীকে হটাবাহার করেছি—হুঁশিয়ার, কাজ দিও না ওকে, সব গড়বড় করে দেবে—

তীর-বেঁধা জানোয়ারের মতো টলতে টলতে বাড়ী এসে মেঝের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে রইল শুকরা। ছটফট করল না। চীৎকার করল না।

এক এক করে জন কুড়ি কুলী দেখতে এল ওকে। তাদের সবারই ওপরে হুকুম হয়ে গেছে—হটাবাহার। বাগানবাবু যাদের নামে চুকলি কেটেছে তাদের কারো নিস্তার নেই।

'কি করব বল শুকরা—'

'কি করব! কাল সকালে আসিস—' যন্ত্রণায় দাঁত চেপে উত্তর দিল শুকরা। কুলীরা সবাই বসে যাবে বলছে। বলছে কেউ কাজে যাবে না—

তামাটে লাল ছেলেটাকে বুকে নিয়ে ঘেঙিয়ে ঘেঙিয়ে কাঁদছিল মুংলী। ঠিক কান্না নয়—কেমন এক ধরনের একটানা আরণ্যক চীৎকার। কিন্তু শুকরার মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে চুপ করে গেল ও। শুকরার চোখে পাপ নেই; ভয় নেই, শুধু যন্ত্রণা আছে—

আতঙ্কে হয় মুংলী।

লম্বা কুলী লাইনটা থেকে একটা শক্ত হল্লা গোঁ গোঁ করে উঠছে মাঝে মাঝে।

মাঝে মাঝে চৌকিদারদের আতঙ্কিত হাঁক শোনা যায় দূর থেকে। জুতো মসমসিয়ে পাথর নুড়ির ওপর দিয়ে কেন জানি ছুটে ছুটে যাচ্ছে কোথায়।

'বাহার সে কোই আদমী ঘুসা হোগা তো পাকড়ো—হুঁশিয়ার—'

কেমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছে সব।

'হাঁড়িয়া—হাঁড়িয়া—'

সায়েব ডেকেছে কুলীদের। প্রথমে অস্বস্তি বোধ করেছিল—ইতস্তত করেছিল—তারপর যে বারোজনকে হটাবাহার করা হয়েছে তারা ছাড়া সবাই গিয়ে জুটেছে কুঠির সামনে। ছেলে মেয়ে বুড়ো। 'বকশিশ দিবি, বকশিশ ?'

'হাঁড়িয়া—হাঁড়িয়া—'

হঠাৎ সায়েব সদয় হয়ে উঠেছেন। দু আনা করে বকশিশ ছুঁড়ে দিয়েছেন সবাইকে। চুরি করে চোলাই করা হাঁড়িয়ার জ্বালা নামিয়ে দিয়েছেন কুলীদের ভেতরে।

'নাচ তোরা—নাচ দেখি মেয়ে মরদে—' কুৎসিত চেহারার মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বাগানবাবু আবার চোখ টেপার চেষ্টা করেন।

ডুম—ডুম—ডুম—

কয়েকজন এলোমেলো ঘা দেয় মাদলে। টলতে টলতে নাচতে শুরু করে কুলী মরদেরা। লাল কাগজের অলংকার গোঁজা কানের ওপর হাত দিয়ে রুক্ষ চুলের গোছা ঠিক করে নেয় মেয়েরা……

হঠাৎ ভুলে গেছে সবাই, মাতাল হয়ে গেছে। সায়েব সিগারেট ধরিয়ে পাহাড়ে হরিণ শিকার করতে বেরিয়ে যান।

ঘুরে ভাঙাচোরা কুলী লাইনটা কেমন ঠুনকো দেখায়। অদ্ভুত নোংরা লাগে।

পচা পাতায় শুকনো আলাম লতা খুঁশে খুঁশে নড়বড়ে কুঁড়ে। মাটি লেপা। ভাঙাচোরা ছনের চাল ফাঁক হয়ে একফালি আকাশের দিকে উন্মুক্ত। নোংরা কয়েকটা মুর্গীর বাচ্চা যাতায়াতের সংকীর্ণ পথে ঠোকর দিয়ে বেড়ায়।

কুড়িজন বহিষ্কৃত শ্রমিক দূর থেকে ওদের মাতলামি চেয়ে চেয়ে দেখে। ওরা সব ভুলে গেছে। হাঁড়িয়া ওদের সব ভুলিয়ে দিয়েছে। পিঠের জন্যে নয় অন্য একটা যন্ত্রণায় মুখ থমথম করে ওঠে শুকরার।

আতঙ্কে থমকে যায় মুংলী—'তুই পালাবি শুকরা। তোর চোখে পাপ আছে। আমাকে ছেড়ে তুই পালাবি…'

'তুই খাটতে পারবি না। আমাকে কাজ দিবে না কোন বাগানে—'

খালি পেটে নেচে চলেছে। খালি পেটে হাঁড়িয়ার নেশা চট করে মাথায় গিয়ে ওঠে।

'আজ আমরা বাগানে খাটবো না—'

'খাটবি না তো নাচ। নাচ দেখি মেয়ে মরদে—'

তেমন নাচ জমে না। কেমন এলিয়ে যায়—কেটে কেটে যায়। আবার নাচতে শুরু করার চেষ্টা করে।

বোকার মতো ওদের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে থেকে অলক্ষ্যে বেরিয়ে যায় শুকরা।

হাটবার নয়—মানসিং-এর দোকানটা কেমন মরা নিঃসঙ্গ! সামনে গাছতলায় ছেঁড়া পায়জামা টুপি পরা জন তিনেক শুকনো চেহারায় ভুটিয়া এসে ডেরা বেঁধেছে। কাজ খুঁজতে এসেছে বাগানে। দু দিন উপোস দিয়ে পড়েছিল—আজ তিনটে রুটি খয়রাত করেছে মানসিং। লোকগুলোর

চোখে মুখে একটা হন্যে ভাব। দেশের লোক মানসিং-এর সঙ্গে কথা বলতেও ভয় পায়।

বিড় বিড় করে বকতে বকতে মানসিং ফিরে এল দোকানে। শুকরা বসে আছে বেঞ্চিটার ওপর। কালো পিঠের ওপর পাটকিলে হয়ে রক্তের চাপ বেঁধেছে।

'আরে বাপ! কেয়া হুয়া?'

'কি বলছিস?'

'কেয়া হুয়া হামকো বলো—'

'হটাবাহার করে দিল সায়েবটা' গুম মেরে জবাব দেয় শুকরা।

মানসিং বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে শুকরার দিকে। কানা বুড়ো মুখের ওপর থেকে চিরস্থায়ী আতঙ্কের ভাবটা কেটে গিয়ে কেবল একটা তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে। হঠাৎ গায়ের কুর্তাটা খুলে ফেলল মানসিং। হাতে কাঁধে পিঠে তিন চার জায়গায় গুলীর পুরনো দাগ। বেঁটে বেঁটে আঙুল দিয়ে এক একটা দাগ দেখায় আর বলে—

'পহলে গোলি মারা তো খাড়া থা হাম। ফির এক গোলি মারা·· তব ভি খাড়া থা। তো ফির এক গোলি মারা—সায়েব মারা ··'

কি জন্যে এসব কথা বলছে মানসিং? ভাল লাগে না শুকরার।

চায়ের গেলাস নিতে এসে দোকানে খাটিয়ে মেয়েটা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। 'হটাবাহার কর দিয়া?'

এই প্রথম কথা বলল মেয়েটা। কথা বলা ওর অভ্যাস নয়। মুখ বুজে কাজ করে যায় শুধু। গোল কপালের ওপর কটা চুল কয়েকটা সোজা হয়ে ওড়ে। সেই দিকে তাকিয়ে ঝোঁকের মাথায় শুকরা বলে—

'পালিয়ে যাব আমি। মুৎলীটা খাটতে পারবে না আর। তুই চল আমার সাথে—'

'হাম ?' খানিকটা অবাক হয়ে মেয়েটা তাকায়। তারপর কিছু না বলে চায়ের গেলাস তুলে নিয়ে চলে যায়।

'কেতনে ডর থা পহলে। সায়েব দেখকে ভাগতা থা কুলীলোগ। আভি কেয়া হুয়া ? কোই ভাগে গা ?...'

আপন মনে বিড় বিড় করে বকে চলেছে মানসিং।

রাস্তার মোড় ফিরছে শুকরা এমন সময় পেছন থেকে ডাকল—'শুনো—' দোকানের মেয়েটা। ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়চোপড়ের একটা ছোট বোঁচকা হাতে নিয়ে পিছু পিছু চলে এসেছে।

'আবার একটা বাগানে কাজ লিব আমরা। তুই খাটবি আমি খাটব—'

মেয়েটা গোল চোখ তুলে শুকরার দিকে তাকায়।

'তুই মারবি আমাকে ? কাজ করতে না পারলে তুই মারপিট করবি, শুকরা ?'

'তোকে কেনে মারব। মুংলীটা খাটতে পারে না...'

'নাচ দেখি—কি হল তোদের ?'

ছিড়ে ছিড়ে যায় ফূর্তি। নেশা জমে ওঠে না। নাচ থামিয়ে একটা অস্পষ্ট যন্ত্রণায় হঠাৎ চুপ করে যায় সবাই।

'তোর ফূর্তি হল বাবু ? আমরা কি করব। হাঁড়িয়া দিলি ধান দিলি না—'

'না, ধান দিলি না—' অন্য কুলীরা আফসোস করে—আর কেমন কঠিন শোনায় তাদের মাতাল কণ্ঠস্বর।

'শালা ! কি হল তোদের ?' অস্বস্তিতে উঠে দাঁড়ান বাগানবাবু।

এদিকে চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেছে। কুলী লাইনের নোংরা সরু রাস্তাটা লাঠি ডাণ্ডা নিয়ে টহল দিচ্ছে চৌকিদারেরা।

'ভাগো। ভাগো আভি, নেহি তো...'

খাপচোরা ছনের চাল লাঠির ঘায়ে ভেঙে পড়েছে। নোংরা কাঁথা, কাপড়, মাটির হাঁড়ি, বেতের টুকরী টেনে এনে ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে ধুলোয়। ছড়ানো ছিটোনো জিনিসপত্রের ভেতর উজবুকের মত বসে রইল কুড়িটা উদ্বাস্ত পরিবার।

'ভাগো—ভাগো—জলদি'—টহল দিতে দিতে কি মনে হয় দু-এক ঘা লাঠি বসিয়ে দেয় চৌকিদারেরা। অসহায়ভাবে খালি হাত আড়াল দিয়ে আঘাত যথাসম্ভব আটকাবার চেষ্টা করে মরদেরা। আর শুধু বকে যাবে।

'মার তোরা, মেরে ফেল আমার ছেলেটাকে'—তামাটে বাচ্চাটাকে হঠাৎ চৌকিদারের বুটের কাছে ছুঁড়ে ফেলে চাপা আক্রোশে হিসিয়ে ওঠে মুংলী।

একটা কচি হাত বুটের তলায় পিষে যায়।

'কি করবি তুরা; খুন করবি?' অনিশ্চিতভাবে অন্য লোকেরা ফিরে দাঁড়ায়। ওদের চোখে একটা অনির্দিষ্ট ছায়া থম্ থম্ করে।

'ধান দিলি না—হাঁড়িয়া দিলি বাবু—?'

যারা নাচছিল তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে এদিকে। টলতে টলতে আসে। আর ভয়ংকর দেখায় তাদের এলোমেলো অনির্দিষ্ট ক্রোধ।

আফিমের নেশা কেটে গিয়েছে জানোয়ারের চোখ থেকে। ছোটনাগপুরের গেরুয়া পাহাড়ের কুহক নেমেছে দলকে দল মদেশী কুলীদের পেশীতে। রক্তের মধ্যে এক আদিম দুর্বোধ্য ডাক শুনে জানোয়ারের পালের মতো চকিত হয়ে উঠেছে সবাই।

কয়েকটা ফায়ার করে সায়েব আর বাবুদের প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছে ক্ষেপা মানুষের সামনে থেকে। তিনজন কুলী মরে পড়ে আছে কুঠির ময়দানে।

শুধু ধান নাই গুদামে। সায়েব ঠকিয়ে গেছে। একবারে দমে যায় সবাই। যন্ত্রণায় কালো হয়ে যায় মুখ চোখ।

'ধান নাই। তিনটে কুলী মরে গেল আমাদের··'

'কি করব বল ?'

'কি করব আমরা। সায়েব পালিয়েছে বটে কিন্তু শিগগিরই ফিরে আসবে সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে। কিছু জিজ্ঞেস না করে বেপরোয়া গুলী চালাবে তারা। খুন হয়ে যাবে মানুষ।'

কিন্তু কেন জানি এই প্রথম পরস্পরকে গালাগালি দিল না কেউ।

'কি করব বলছিস ?'

দু-একজন স্থিরভাবে তাকায় তারপর চলে যায় পাহাড়ের দিকে। চায়ের পাতা না—টুক্‌রী ভরে ভরে পাথর নিয়ে আসছে মেয়েরা। স্তূপ দিয়ে রাখছে কুলী লাইনের সামনে। হেরে যেতে হবে জানে—তবু।

পাথরের চাঙ হাতে নিয়ে নিশ্চিত পদক্ষেপে টহল দিয়ে চলেছে আরণ্যক মানুষ।

ভুটান পাহাড়ের কর্কশ নীল কুঁজে ঘা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে আসে রাইফেল ফায়ারের শব্দ। শুকরা থমকে দাঁড়ায়—

কি হল বাগানটায় ?

'গোলি কা আওয়াজ !' মেয়েটা বলে।

একটু ইতস্তত করে শুকরা তারপর আপন মনে বিড়বিড় করে—

'কি হল বাগানটায়···'